পঞ্চম অধ্যায়

দেবেশ রায়ের গল্পের আঙ্গিক ও গঠন কৌশল

সাহিত্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার একটা নির্দিষ্ট রূপ থাকতে বাধ্য। সেই রূপ কল্পনা বা অনুভূতি যখন লেখার মধ্য দিয়ে বিধৃত হয় তখন সেই লেখার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে তার আঙ্গিক। তাইতো সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত ছোটগল্পেরও একটা আঙ্গিক থাকবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আঙ্গিকহীন কোন সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না।

কোন একজন লেখকের রচনা অর্থাৎ তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক, যাই রচনা করুক না কেন সেই লেখার একটি অবয়ব থাকতে বাধ্য। রচনা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি দুটি দিক অবলম্বন করতে পারেন। প্রথমতঃ পূর্ববর্তী লেখকের আদর্শ বা নির্মাণশৈলী অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ লেখক পূর্ববর্তী লেখকের নির্মাণ কৌশল থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র একটি আঙ্গিক গড়ে তুলতে পারেন। সেই রচনাশৈলীই অনেক সময় একটা বিশেষ আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। সমসাময়িক বা উত্তরকালের লেখকের কাছে অনেক ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

আমাদের আলোচ্য ছোটগল্প। ছোটগল্পের সাধ অনেক সাধ্য সীমিত। তার লক্ষ্য বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। তার আঙিনাটি ছোট তবুও জীবনের সমগ্রতাকে ধরাই তার অন্যতম উদ্দেশ্য। অনিবার্যভাবেই ছোটগল্পকে আশ্রয় করতে হয় অনেক কৌশল। যাতে লেখক কর্ম উপকরণেই গল্পের মূল সুর ধরিয়ে দিতে পারেন। ছোটগল্পের অবয়বের মধ্যেই তাই ছড়িয়ে আছে অজস্র ব্যঞ্জনাগর্ভ কারুকার্য—তার ভাষায়, শব্দচয়নে, বাক্যের যথার্থ ব্যবহারে, উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহারে।

গল্পকার দেবেশ রায় সচেতন শিল্পী। তিনি গল্পের ফর্ম নিয়ে ভাবেন, ছোটগল্পের নতুনতর রীতি পদ্ধতির দিকেই তাঁর ঝোঁক। তাঁর গল্পের কনটেন্ট যে পর্যায়ের তাতে আঙ্গিক ও গঠনকৌশলে উচ্চ পর্যায়ের একটা ধারা তিনি অতি সহজেই তৈরি করতে পেরেছেন। গল্পের মূল সুরটিকে ধরিয়ে দিতে কোন কোন সময় তিনি প্রতিধ্বনির মত শব্দ

বা বাক্যকে কয়েকটি পরপর সাজানো বাক্যের মধ্যে খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। আঙ্গিক ও গঠন কৌশলের দিকগুলি গল্প জীবনের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এমন সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন যেন প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে শৈল্পিক আবেদন পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়ে। শব্দ চয়নে, ভাষা গঠনে, বাক্যের যথার্থ ব্যবহারে, উপমা সংযোগে, রস সৃষ্টিতে নিজস্বতা ও তার দক্ষতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পে লক্ষ করে থাকি গল্প গড়ে তোলার প্রতি তাঁর যত্ন। যে যত্ন শুধুমাত্র প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয় তার সমস্ত গল্পে কাজ করে এক নিখুঁত বুনোট। বেশিরভাগ গল্পেই গল্পের প্রথম থেকে শেষ অবধি এক গতি কাজ করে। ফলে গল্পের রসাস্বাদনে পাঠককে গল্পের শেষ লাইন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ছোটগল্পের আঙ্গিক বিচারে এই রসাস্বাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেবেশ রায় গল্পে রূপাঙ্গিক গঠনের ব্যাপারে totality ধারণা বিশেষ মূল্যবান। কেননা তাঁর গল্পে রয়েছে সেই আবিভাজ্য শক্তি যার সাহায্যে গল্পকার দেবেশ রায় পাঠকের আত্মাকে পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে রাখতে পারেন। বাক্যের গঠনে সংলাপে রয়েছে ইঙ্গিতধর্মীতা।

ছোটগল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য শেষ হয়েও হইল না শেষ অন্তরে অতৃপ্তি নিয়েই ছোটগল্প শেষ হবে। ছোটগল্পের অন্যতম এই বৈশিষ্ট্যটি দেবেশ রায়ের অনেক গল্পে লক্ষ করি। ভাবের এক মুখিনতা তাঁর গল্পের একটি অন্যতম দিক। ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি বাংলা ছোটগল্পে অনেক পরিবর্তন এনেছেন। ছোটগল্পের পূর্ব পরিচিত আঙ্গিক যেমন অনুসরণ করেছেন তেমনি সেই আঙ্গিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে এসে স্বাধীন ভাবে গল্প লিখেছেন। তিনি গল্পের আয়তনকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। গল্প-উপন্যাসের পৃথকীকরণ তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিক। গল্পসমগ্রের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা অংশে তিনি বলেছেন—

> “ ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ লেখা হয়ে গিয়েছিল একেবারে, তারপর পাঁচ-ছ বছর ধরে এরই বিভিন্ন অংশ কাগজ পত্রে বেরতে থাকে কখনো উপন্যাস হিসেবে কখনো বড়োগল্প বা ছোটগল্প হিসাবে এতে আমার কাছে উপন্যাসের সমগ্রতার চেহারাটা যেমন সুষ্ট আকার পায় তেমনি আখ্যানের স্বয়ং সম্পূর্ণতার কথাটাও ক্রমেই

> প্রধান হয়ে ওঠে। আখ্যানকে একটি ছোটগল্প বা একটি উপন্যাসের ভিতরে সম্পূর্ণ আঁটাতে গেলে আখ্যানের সর্বাতিশয়তা খর্ব হয়। আখযানকে যদি সেই নিগড় থেকে মুক্ত করে দেওয়া যায় তা হলে তা কখনো ছোটগল্পে, কখনো বিবরণে, কখনো উপন্যাসে কখনও কাহিনীতে ছড়িয়ে যেতে পারে।”[১]

দেবেশ রায় এই ভাবনা চিন্তা থেকেই ছোটগল্পের গঠনকৌশল তথা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমি ধারা সংযোজন করেছেন। দেবেশ রায় ‘মফস্বলী বৃত্তান্ত’ ‘আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে’ প্রভৃতি উপন্যাসের অংশ বিশেষ প্রথমে গল্প হিসাবে ছাপা হয়, ক্রমশ আখ্যানের স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে যতই স্বাধীন ভাবে এগোতে থাকেন ক্রমশ আখ্যান দুটি উপন্যাস হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ এর পর তিনি গল্প লিখেছেন কিন্তু সংখ্যা ক্রমশ কম। এই সময় তিনি উপন্যাস বা বড়ো আখ্যান লেখার দিক থেকেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। তাই দেবেশ রায় উপন্যাসের দিকে বেশি মনোযোগী হওয়ার পূর্বেই গল্পসমগ্রের প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের মোট ৪৪টি গল্প ছোটগল্পের ফর্মকে স্বীকার করে। তৃতীয় খণ্ডের ২৩টি গল্পের মধ্যে বেশিরভাগ গল্পই ছোটগল্পের ফর্মকে স্বীকার করলেও বেশ কিছু গল্পে গল্পকার দেবেশ রায় গল্পের কাহিনি বিন্যাস ও ছোটগল্পের আয়তনের সীমা লঙঘন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আখ্যান বলার ধরণ তাঁকে গল্পকার হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যদা দান করেছে। উল্লেখ্য গল্পসমগ্রের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের গল্পগুলি বিষয় ভাবনায় তাঁর সাহিত্য কর্মের উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৭০ এর পর থেকেই গল্পকার দেবেশ রায় গল্পের বিষয়কে, কাহিনিকে বেঁধে না রেখে আখ্যান বৃত্তান্তে মুক্তি দিয়েছিলেন। গল্পগুলির এক-একটি আখ্যান যেন এক-একটা গতিশীল জল তরঙ্গের মত। এখানে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও গল্পকার দেবেশ রায় এক ছত্র ছায়ায় অবস্থান করেন।

১৯৫৫-য় ‘হাড়কাটা’ গল্প দিয়ে গল্পকার দেবেশ রায়ের যাত্রা শুরু। তারপর সময়ের প্রবাহমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহুরূপে বাস্তবতায় গল্পকার দেবেশ রায় আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন এবং ছোটগল্পের নিজস্ব আঙ্গিক ও গঠন কৌশল সৃষ্টি করেছেন। দেবেশ রায়ের সাহিত্যকীর্তি এবং এই কৃতিত্ব অর্জনের অন্যতম কারণ হল তাঁর সাহিত্য মাটির বুক

থেকে উঠে আসা। এই মৃৎগন্ধী হৃৎস্পন্দন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষি পাঠককে মুগ্ধ করেছে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রে, অখণ্ড বাঙালি জীবনের রূপ চিত্রাঙ্কনে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিল্প সৃষ্টিতে মগ্নতা দেখিয়েছেন যে মুষ্টিমেয় ক'জনমাত্র গল্পকার দেবেশ রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। গ্রাম ও নগরজীবনের বহুকৌণিক জীবনচর্যা, প্রান্তিক মানুষের লোকঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতির সাবলীল ও লক্ষ্যভেদী ব্যবহার সমসাময়িক গল্পকারদের থেকে দেবেশ রায়কে পৃথক ও স্বতন্ত্র করেছে। ফলে গল্পে গল্পে তিনি যেমন হয়ে উঠেছেন মানুষের যাপন পদ্ধতির আধুনিক ব্যাখ্যাকর্তা তেমনি তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে আমাদের দৈনিক কালিক ও ইতিহাসের চলমানতার নিকষিত ফল। গল্পে গল্পে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জিজ্ঞাসা, অন্বেষণ নানা আঙ্গিককে প্রতিফলিত করেছে। প্রসঙ্গত গল্পকার দেবেশ রায়ের গল্পের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম—

ক. দেবেশ রায়ের গল্পে মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হয়ে থাকেনি, হয়েছে ইতিহাস সম্পর্কিত বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাও ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। মোটকথা তিনি গল্পে ব্যক্তির কিংবা গোষ্ঠীর ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তির ইতিহাস মানে ব্যক্তিগত জীবনী নয়। অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তির সংলগ্নতা কিংবা অসংলগ্নতার সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার।

খ. তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলির মধ্য দিয়ে দেবেশ রায়ের জীবন দর্শনের কথা উঠে এসেছে। গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায় স্থানিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহৎ জীবনে প্রবেশ এবং তার সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র।

গ. দেবেশ রায়ের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গল্পকে ইউরোপীয় আদর্শের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কেন্দ্রিকতায় আনার মধ্যে। তিনি ভারতীয় আঙ্গিক ও আদর্শের সন্ধান করে গেছেন। চলমান বাস্তবতাকে অভিজ্ঞতায় ধরে তাকে শিল্প করে তোলার কাজে তিনি দেশীয় কথকতায় রীতি আনয়ন, রূপকের আয়না ব্যবহার, অভিজ্ঞতার আনুপাতিক মেলবন্ধন নির্মাণ এবং ধ্রুপদী ঘরানার শিল্পরূপকে আত্মীকরণ করে তিনি নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি করেছেন। আমাদের কাছে এ এক বিস্ময়কর সম্ভার।

ঘ. তাঁর গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে সময়, ইতিহাস এবং রাজনীতির কথা। সময় এবং ইতিহাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে রাজনীতি। রাজনীতির আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিরা রক্ষাকর্তা হিসাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িয়ে পরার কথা নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে এই সম্পর্ক সূত্রটি তুলে ধরেছেন। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে গল্পগুলি শিল্প সুষমায় ভাস্কর হয়ে উঠেছে।

ঙ. দেবেশ রায় ছিলেন একজন দক্ষ শিল্পী। তাঁর শব্দ চয়ন, ভাষা নির্মাণে অভিনব কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতসব বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত হওয়ায় তাঁর গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ভিন্নধর্মী সৃজনের অংশ হয়ে উঠেছে। আর একারণেই তিনি বর্তমান সময়ের একজন স্বতন্ত্র শিল্পী।

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের নিরীখে এবং গল্প আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পের আঙ্গিক সন্ধানের চেষ্টা করবো। এই সব ভাব ও বিষয়কে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্বের গল্পকারেরা নিজস্ব রচনা রীতিকে অবলম্বন করে প্রকাশ করেন এবং এই স্বাতন্ত্রের মধ্যেই গল্পকারের অমরত্ব নির্ভর করে।

দেবেশ রায়ের গল্পের আঙ্গিক আলোচনায় একথা গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁর কোনো একটি গল্পে হাত রেখে বলা যায় না এখানেই দেবেশ রায়। তার গল্পের বিকাশ ও ক্রমবিবর্তন অনেকখানি। তা প্রাণময় বাংলা লেখকদের মধ্যে স্বতন্ত্রও। তার গল্প আলোচনায় অতিরিক্ত টেকনিক, ফর্ম, বা স্টাইলের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করি যে তিনি কেবলমাত্র এই টেকনিকে, এই স্টাইলে গল্প লেখেন তাহ হল দেবেশ রায়ের গল্প সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। কেননা, তার গল্পে ফর্ম, বা স্টাইল বা আঙ্গিক কেবল বিষয়ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয় গল্পে পরীক্ষাই বিষয়কে নিয়ে। বিষয়ই যেখানে ফর্ম সেখানে ফর্মের বিশেষ বন্ধন থাকতে পারে না। দেবেশ রায় গল্পের বিষয় নিয়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নানা ফর্মের, নানা টেকনিকের ও ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। ফলে তাকে কোনো এক শ্রেণির বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। বন্ধনমুক্ত এক ছোটগল্পের পরীক্ষায় তিনি বাংলা ভাষায় বর্তমান সময়ের এক অন্যতম গল্পকার হয়ে ওঠেন।

দেবেশ রায়ের এক শ্রেণির গল্পে স্থানিক ও অন্ত্যজ মানুষের হৃদয়ের ক্রন্দন ধ্বনি

শোনা যায়। এই গল্পকে দেবেশ তাঁর সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব মাঠ-মাটি-মানুষের গন্ধমাখা জীবনের চিত্রকে গল্প শিল্পের বিষয়ীভূত করেছেন অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতির জায়গাটিকে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃতর করতে করতে। ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের রাজনীতি তার সুবিধাবাদ, তার স্বার্থ সর্বস্বতা, আদর্শহীনতা, ধ্বংসাত্মক ভূমিকা, তার অর্থনীতি যে ফাঁদ ভারতবাসী বা বঙ্গ বাসীর জন্য পেতে রেখেছে, সেই ফাঁদের কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। এই অস্তিত্ব সংকটের তিনটি স্তর রয়েছে এখানে—ক. আন্তঃমানবিক সম্পর্ক সত্তার, খ. বিপন্ন অস্তিত্বের ক্রন্দন ধ্বনি এবং গ. সমান্তরাল সত্য নির্মাণের স্তর। 'হাড়কাটা' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে মানবিক অস্তিত্বের সংকট, বিপন্ন অস্তিত্বের ফলে মানবিক পরিবর্তন। গল্পকার দেখিয়েছেন সংকটে পরে মানুষের মন যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। পারিপার্শ্বিকতা, সৌন্দর্যবোধ, মানবিক অনুভূতিকে হারিয়ে মানুষ যেন হয়ে উঠেছে বিধ্বস্ততার প্রতীক। গল্পটি আন্তঃমানবিক অস্তিত্ব ও সংকটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের গল্প।

গল্পে নানকু কাহার এক কসাই। সে মাংসের ব্যবসা করে। নানকু প্রথম জীবনে, যুদ্ধের সময় ছাগল পাঁঠা জোগার করে দিত ঠিকাদারকে। তারপর সে নিজেই এ ব্যবসায় নেমেছে। প্রথম জীবনেই তার পরিচয় হয় তারাপুর গ্রামের মোড়লের মেয়ে গাধুলির সাথে— ‘‘গাধুলির হাসির গমকে কেমন তার সারাটা শরীর টইটম্বুর কাল পুকুরের মত টলটলিয়ে উঠল।’’[২] তারপরই তারা পারি দিয়েছে উত্তরবঙ্গের অরণ্যঘেরা অঞ্চলে। সংসার বেঁধেছে, দুই পুত্র ও হয়েছে। সাত সকালে নানকু যখন শ্লটারুমের দরজা খুলতে যায় তখন রোজই একটা হাড় ঝিরঝিরে কুকুর যেন তাকে জনহীন বাজারে সকালের অভ্যর্থনা জানায়। নানকু তার ছাগলের অবশিষ্ট হাড় খেতে দেয় তাকে। কিছুদিন পরে সেই কুকুরটার সাথে যুক্ত হয় এক পাগল। তারা রোজ সকালে নানকুর জন্যই যেন অপেক্ষা করে। প্রতিদিন একইভাবে কুকুরটাকে খেতে দেয় নানকু; তারপর সেই দুই প্রাণীর খেলা দেখে তিনকোনা মাটিটায়। এ যেন নানকুর চীরকালীন কর্ম। কসাইয়ের কাজ করতে করতে সে এক নির্মম, নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তাই স্ত্রী গাধুলি নিজ সন্তানের জন্য পাঁঠার মেটে আনতে বললে সে আনে না। গাধুলি রূপার হাসুলি চাইলে সে তাকে প্রহার করে। পরদিন সকালে রাগবশত আঘাত করে সেই কুকুরটিকে তারপর সুর তীক্ষ্ণ টাটকা রক্তমাখা ছুড়িটা দিল দরজার

দিকে। রক্তাক্ত পিঠ নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পালায় কুকুরটা। তার কসাইয়ের জীবন ও স্বামী-স্ত্রীর জীবনের মধ্যে সচলতার বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। সে যেন এক বিপন্ন জীবনযাপন করে।

আবার অথচ সেই নানকু কাহার আবার বসে বসে পাগল ও কুকুরটার খেলা দেখে। দুটো প্রাণী প্রজাতিতে পৃথক হয়েও যেন এক আর্থিক সম্পর্কে আবদ্ধ। একজন মানুষ হয়েও পশুর মত আচরণরত, অন্যজন পশু হয়েও যেন মানবগুণের অধিকারী—

> "একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নানকু দেখল তিনকোনা মাঠিটায় ঐ যেখানে কুকুরটা আর পাগলটা খেলা করে, খায় আর ঘুমায়, সেখানেই মাটিতে মুখ গুজে শুয়ে আছে কুকুরটা আর পাগলটা একপাশে একরাশ কচু পাতা নিয়ে একটার পর একটা পাতা থেকে ডাটা চুষে রস বের করে কুকুরটার পিঠের কাটা জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছে। কুঁই কুঁই করে শব্দ করছে কুকুরটা।"[৩]

এ দৃশ্য যেন এক মমতার বন্ধনে আবদ্ধ দৃশ্য। এই মমতাই প্রবাহমান জীবনের ইতিহাস। তাই গাধুলিকে মারার জন্য তার অনুতাপ হয়। চারিদিকে পাতাভরা গাছ। সজনে ফুল দেখে সে অনুভব করতে পারে আগত কালকে। নানকু যেন এক জীবন সত্যের সাথে পরিচিত হয়। শেষে মাংস নিয়ে বাড়ি আসে।এই নানকুর দৈহিক গঠনের পরিচয় দিয়েছেন লেখক এইভাবে—

> "বাঁশের মতো ছয় ফুট লম্বা আর পিচের মতো কুচকুচে কালো নানকু যখন ওর সুর সরু ঠ্যাং দুটো গজ দেড়েক তফাতে ফেলে-ফেলে হাঁটে, তখন মনে হয় ওই পদক্ষেপেই বোধহয় সমুদ্র পার হওয়া চলে। চোয়ালের হাড় দু'টো বিদ্রোহ করেছে ওপরের দিকে—তারই মধ্যে লাল টকটকে একজোড়া চোখ। লোকে বলে পাঁঠা কাটতে কাটতে পাঁঠার রক্তও এসে মিশেছে নানকুর চোখে। তাই ওর চোখ এত লাল। কপালের ওপর অজস্র দাগ, মনে হয় একটা কালো আবলুশ গাছের ওপর একটা বন্য বাঘ শিকার না পেয়ে হিংস্রভাবে থাবা মেরে মেরে গাছটার সর্বাঙ্গ ক্ষত-

বিক্ষত করেছে।"[৪]

উদ্ধৃতিতে ভাস্কর্য প্রতিভা ধরা পড়েছে। দেবেশ রায়ের স্বকীয়তা এর মধ্যেই ধরা পড়ে একজন ভাস্কর্য শিল্পীর মত তিনি গল্পের চরিত্রকে মূর্তি রূপের প্রত্যক্ষতায় চিত্রিত করেন।

'উদ্বাস্তু' গল্পটি ১৯৫২ সালের পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশ পায়। গল্পটির প্রকরণ কৌশল অভিনবত্বের দাবি রাখে। গল্পটিতে অতীতের ঘটনা, বর্তমান মানুষের অবস্থা সংলগ্নতা কিংবা অসংলগ্নতাকে দেখাতে চেয়েছেন। গল্পটিতে সময়ের প্রেক্ষিতে সত্যব্রত ও অণিমার বিপন্ন অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে সাবলীলভাবে। এর পিছনে যে চালিকা শক্তি কাজ করেছিল তা হল রাজনীতি। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, মানুষের কর্মকাণ্ডকে, জীবনকে এমনভাবে প্রভাব ফেলে যেন মানুষ শুধুমাত্র ব্যক্তির হয়ে থাকে না।

সত্যব্রত ও অণিমা বল্লভপুরে এক কন্যা সন্তানের সাথে বাস করে। একদিন হঠাৎ দু'জন ব্যক্তি তাকে বাড়িতে এসে থানায় আত্মপরিচয় প্রমাণ করার জন্য যাবার কথা বলে সত্যব্রতকে। একথা শুনে সত্যব্রত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরে থানায় যাবার জন্য। সে থানায় গিয়ে বাড়ি না ফিরলে অণিমা খবর নিয়ে জানতে পারে অণিমাকেও আত্মপরিচয় দিতে যেতে হবে থানায়—

> "যে মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে যে গাছ সেই মাটি ছেড়ে; যে পরিবারের মধ্যে সে স্বীকৃত, সেই পরিবার ছেড়ে; আজ বা কাল থানায় গিয়ে প্রমাণ দিতে হবে—তাঁর আত্মার প্রমাণ, আজ অথবা কাল তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ, আজ অথবা কাল।"[৭]

থানা থেকে যখন সত্যব্রত বাড়ি ফেরে তখন সে বিধ্বস্ত, বিপন্ন—"ঘাড় ভাঙা মুরগার মত গলাটা ঝুলছে; ভেজা কুকুরের মতো চুলগুলো, বিশৃঙ্খল, কঠোর আশ্রয়ে মৃত্যুর মত শীতলতা, আঙ্গুলগুলো চামড়ার গ্লাভসের মত যেন পাঞ্জার অনুকরণ।"[৬] অঞ্জুর অবর্তমানে নিরব সত্যব্রত অণিমার হাতে একতাড়া কাগজ দিয়ে চোখ বুজল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফলাফল মানুষের জীবনকে ভয়ানকভাবে বিধ্বস্ত করেছিল। এই সময়ের সুসম্পাদিত ও সুসংহত তালিকা না থাকায় পৃথিবীর নানা দেশের অধিবাসীদের দেশ, জাতি, ভাষা, বংশ চিহ্নিত কররে নানা ব্যাঘাত ঘটেছে। পৃথিবীর বহু প্রান্তে বহু বেনামী

ব্যক্তি আছে। তাই ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও তার বাইরে নয়। তাই এই 'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' নামক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যাতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে চেনা যায়।

আর তাই অনুসন্ধানের ফলে যা সামনে এসেছে তা হল—সত্যব্রতর বর্তমান ২৩০/এ/৬ হোগুিংস্থ মোকাম-এর মালিক শেখ মনসুর আলি, জেলা পাবনা। দাঙ্গার কারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঐ পাড়ার শ্রী বনবিহারী মল্লিকের তত্ত্বাবধানে রেখে যান। কিন্তু তিনি মালিক হয়ে জমিটি সত্যব্রতের কাছে বিক্রি করেন।

সত্যব্রতের আত্মপরিচয় সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলে জানা যায়। সত্যব্রতের বাবা পুণ্যব্রত লাহিড়ী। সত্যব্রতের পরিচয় থেকে জানা যায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মাস্টারি ও কেরানিগিরি করেছেন। তার মতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সালে বি.এ. পাশ করেন। কিন্তু দেশভাগের ফলে বি.এ. সার্টিফিকেট পান না বলে জানান। আবার তদন্তে জানা যায় ঐ সালে এই নামেই এক ব্যক্তি বি.এ. পাশ করলেও খুলনা যাবার পথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহত হন। তাদের সন্দেহ বর্তমান সত্যব্রত নিহত সত্যব্রতের কোন নিকট আত্মীয় বা পরিচিত।

সত্যব্রতের স্ত্রী অণিমা সম্পর্কেও অনেক পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। যার ফলে অণিমার আত্মপরিচয় সংশয়াগ্রস্ত হয়। এক তথ্য থেকে জানা যায় অণিমা পাকিস্তানে ছিল, তার বাবার নাম শ্রী হেমচন্দ্র সান্যাল। তাদের পাড়ায় ছিল এনামূল হক চৌধুরীর বাড়ি। তার কাছ থেকে জানা যায় ১৯৫০ -এর দাঙ্গার সময় অণিমা স্বপরিবারে এনামূলের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরে তার পিতা ভারতে চলে আসে। তবে অণিমা ও এনামূলের প্রণয় থাকায় অণিমা আসে না, পরে ১৯৫১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কুমকুম নাম দিয়ে তাদের বিবাহ হয়।

আবার আর এক মতে এনামূল দাঙ্গার সময় একপ্রকার জোড় করেই অণিমাদের সপরিবারে আটকে রাখে। অণিমার বাবা পরিবারের প্রাণ রক্ষার্থে অণিমাকে ওখানেই ছেড়ে আসে। পরে এনামূল ও অণিমার বিবাহ হয়। দাঙ্গা থামার পর এইসব ঘটনার তদন্ত হবে। তাই অণিমার নাম পরিবর্তন করা হয়। অন্য তথ্য থেকে জানা যায় যে এনামূল অণিমাকে

দূরে রাখার জন্য পিতৃগৃহে পাঠান। পিতৃগৃহে এসে অণিমার একটা চিঠিও পাওয়া যায় এনামূলের উদ্দেশ্যে। আবার অন্য সূত্র মতে অণিমা অনেক কষ্টে এনামূলের অত্যাচার থেকে পালিয়ে আসে বাবার কাছে। পরে ১৯৫২-র ১৭ই মার্চ তাদের একটি মেয়ে হয়।

এই পরস্পর বিরোধী আত্মপরিচয়গত মতবাদ তাদের জীবনকে গভীর অন্ধকারে ঠেলে দেয়—''আত্মপরিচয়হীন উদ্বাস্তু অণিমা আর সত্যব্রত যে অন্ধকারে তরল লোহার ফুটন্ত সমুদ্র ভেবে বিলীন হতে চাইল।''[৭] একে অপরে আত্মপরিচয়হীন সন্দেহ যেন বলে—''তুমি তুমি নও সত্যব্রত, তুমি তুমি নও অণিমা।''[৮] দাঙ্গার সময় শুধু যে মানুষ লড়াই করছে তাই নয়; এই লড়াই কালীন সময় বসবাস করা মানুষগুলোর জীবনযাত্রাকে বিপন্ন করে তুলেছিল।

'নিরস্ত্রীকরণ' গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে রাজনীতি। গল্পটিতে বিপন্ন অস্তিত্বের সংকটকে দেখানো হয়েছে। লেখক রাজনীতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দৈনন্দিন কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনায়; তার আভাস আছে গল্পটিতে। চারিদিক যখন রাজনীতির ভাবাবেগে উত্তাল তখন তিনি নিজেই জানিয়েছেন—'' সেই রাজনীতির ভাঙন থেকে বাঁচতেই বোধ হয় দৈনন্দিন সাংগঠনিক কাজকর্মকে তখন অমন মরণ পণ আঁকরে ধরে ছিলাম।''[৯] লেখকের গল্পের আঁড়ালে রাজনৈতিক নিরাপত্তা গড়ে ওঠেনি, তার পরিবর্তে গল্পটির বাস্তবতা আরও অনেক বেশি বাস্তব হয়েছে, ফলে গল্পটির ভেতর তৈরি হয়েছে অন্য আর এক গল্প, কোনও রূপক নয়।

আলোচ্য গল্পটি শুরুই হয়েছে এক অন্ধকার কামরার বর্ণনা দিয়ে। যে কামরার বাইরে আছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অনেক রেললাইন, মাথার উপর অনেক তার। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আলো দেখলে যেন মনে হয় আলোগুলো সৌরজগৎ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। দূরে স্টেশনে মানুষের আনাগোনাও বর্তমান। সেই রেলের অন্ধকার কামরায় দুই মহিলার কথোপকোথন চলছে। লেখকের বর্ণনায়—''ভদ্রমহিলার গলার স্বর মাঝারি দামের জর্দা খাওয়া জামা খানদানি বোঝা যায় না, বেশি কথা বলার জন্য বনেদিআনা নষ্ট হয়েছে নাকি পুরো তৈরি হয়নি।''[১০] প্রথমার এক ছেলে ও মেয়ে। ছেলে কোলকাতায় ডাক্তারি পরে। দ্বিতীয়ার গলার স্বর নিস্প্রভ, তার স্বামী এখন কিছুই করেন না। তার পাঁচ

ছেলের প্রথম জন বিদেশে ঔষধের রিপ্রেজেনটেটিভ, মেজো ছেলে ইস্কুলে চাকরি করে, তার পরের জন খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে এবং তারই সঙ্গে মেজো ছেলে এম.এ. পরে। এই বর্ণনা নিতান্ত ঘরোয়া গোছের এবং মেয়েলী সুলভ বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিষ্ঠা দান করে।

রেলের অন্য একটি কামরায় উঠেছে এক নব দম্পতি, তাদের একটি শিশুসন্তান। বাচ্চাটি প্রবল স্বরে কাঁদলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে নানা শলাপরামর্শ চলে। কামরায় আর এক আকর্ষণীয় চরিত্র পোর্টফোলিও ব্যক্তি। এছাড়াও রয়েছে চারজন যুবক। এদের সবাইকে নিয়েই রেলের একটি অন্ধকার কামরার দৃশ্যকল্প চিত্রিত হয়েছে।

যুবকদের আলাপ চারিতায় সমসাময়িক নানা অবস্থার তথা ঘটনার কথা যেমন উঠে আসছে, তেমনি পাশাপাশি উঠে এসেছে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উত্তাল অবস্থা, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা। তাদের আলোচনায় বিষয়টি পরিস্কার—“মাইরি ঘুগ ঘুগ এ চ্যাচানি আর ভালো লাগে না। কি দরকার বাবা আমাদের পরীক্ষা দেওয়া, পাশ করা, চাকরি খোঁজা- কোনদিন ফাটাস করে বোমা ফাটাবে, ব্যাস ভবলীলা সাঙ্গ।”[১১] এমতাবস্থায় গাড়িটা যাবার জন্য বাঁশি বাজালে পোর্টফোলিও ব্যক্তি দরজায় ছিটকিনি লাগাতে বলেন, এও বলেন যে স্টেশন থেকে চোর ওঠে ও পাঁচ সাতটা চুরি হয় রোজই। চোর চুরি করে—ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বেডিঙ, মানুষ অবদি, আর না পারলে গলার হার, কানের দুল এইসব। ফলে রেলের কামরার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় ও সিদ্ধান্ত হয় যতই ডাকাডাকি করুক দরজা কিছুতেই খোলা হবে না। কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে কাউকে ডাকতে শোনা যায়। যুবকের মধ্যে একজন মতপ্রকাশ করলেও সকলে বাধা দেয়। তারপর ট্রেনটা শব্দ করে এগিয়ে গেলে তারা নিজেদের মানবিকতার কাছে দ্বিধান্বিত হয়। নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে অন্যকে মেরে ফেলে মানবতার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তারা।

আসলে বিপর্যস্ত, বিপন্ন সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে এতটাই বিপন্ন করে তুলেছে যে মানুষ সঙ্কট থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই মরিয়া হয়ে গেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে জ্ঞানহীন, দিশাহীন করে তুলেছে।

‘আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা’ গল্পটি ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত

হয়েছিল। গল্পের বিষয়ভূমিতে রয়েছে একটি পরিবারের সদস্যদের কথোপকথন এবং গভীর সত্যের মুখোমুখি হওয়ার কথা। পরিবারের দুই ভাই; বড় ভাইয়ের বক্ষ ও তার সন্তানদের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। পরিবারের বড় ভাই-এর বয়স ৪০ এর উপরে; সে প্যারালিসের রোগী। একটা পাশ তার অবশ। তার স্ত্রী তটিনী, তার দুই ছেলে এবং চার মেয়ে। এই পরিবারে একমাত্র শিশিরই আর্থিক সংস্থান করে। পরিবারের সমস্ত খরচা তার অর্থেই চলে—তাই খোকন তাকে জনক ও পিতার মধ্যে পার্থক্য কোথায় জিজ্ঞেস করলে শিশির থমকে যায়। তবে পারিবারিক কাজ কর্মের ভার তটিনীর ওপর—"কিন্তু সকাল থেকে তার কাজকর্মের কেন্দ্রে থাকে শিশির।"[১২] শিশিরের খাওয়া ও কাজকর্মের যাবতীয় দায়িত্ব তটিনীর। শিশিরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বৌদি ও দেবরের; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বন্ধু। এই সবের ঊর্দ্ধে উঠে শিশির তাকে কাছে পেতে চায়।

অন্যদিকে বাড়িতে জনসংখ্যা কম নয় অথচ একজনের ওপরই সব আর্থিক দায়িত্ব বর্তায়—সে শিশির। তার বয়স পেরিয়ে গেলেও সে বিয়ে করে না দাদার সংসারটার কথা ভেবে। গল্পকারের কথায়—"শিশিরের ম্যানিব্যাগ আজ দশ বছর ধরে এই টেবিলের ওপর আছে, থাকবে। দাদারটা হারিয়ে গেছে। শিশিরেরটাও হারিয়ে গেলে আর একটা আসবে কিন্তু শিশিরের ম্যানিব্যাগ এখন হারালে চলবে না। খোকনের বয়স মোটে চৌদ্দ।"[১৩]

রবিবারে শিশির বাড়িতে থাকে, তার কাছে এই দিনটা মহোৎসব। এই দিনে তটিনীও ব্যস্ত থাকে। সবজি কাটা, রান্না করে তারপর খোকনের বাবাকে তেল মাখিয়ে বারান্দায় এনে স্নান করিয়ে দেয়, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে আবার ঘরে শুয়ে রেখে আসে এভাবেই দুপুর কেটে যায়।

রাতে তটিনী লণ্ঠন দিয়ে শিশিরের দরজার বাইরে বেরিয়ে অন্য চৌকাঠে ঢুকে লণ্ঠনটি রাখলে শিশিরের খোলা দরজায় এক আলোর দরজার ছায়া আঁকা হয়—এভাবেই চলে বছরের পর বছর। পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে থাকে আজীবন—এভাবেই দিন হয়, রাত হয়; কিন্তু পৃথিবীর চলার কোনো পরিবর্তন হয় না। তেমনি—"রাত্রি। তটিনী দরজা বন্ধ করে।... সকাল। তটিনী দরজা খোলে।"[১৪] এভাবেই চলে তাদের জীবন পরিবর্তনহীন ভাবে—"ঘুরে ফিরে, বারবার পরিবর্তন নেই। মাঝে মাঝে তার ছিঁড়ে। কিন্তু

সেটা তো জীবন নয়, জীবনের পদটিকা।"[১৫]

খোকনের প্রশ্ন শিশিরের কাছে 'জনক ও পিতার' পার্থক্য কী? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশিরের যেন কোথাও বাঁধে। তাই তার উত্তর জনক হল জন্মদাতা—এখানে খোকনের জনক তার বাবা; আর পিতা হল পালনকর্তা অর্থাৎ শিশির। এখানে বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখক।

অন্যদিকে শিশিরের দাদার শিশিরের দিকে ভাষাহীন চাহনি যে শিশিরকে দায়িত্ব থেকে সরে না যাওয়ার জন্য বলে। সারাদিন একই কাজ তটিনীকে ক্লান্ত করে তাই বেলা শেষে শিশিরের সাথে বাক্যালাপ তাকে শান্তি দেয়। শিশিরকে বিয়েও করতে বলে সে। এভাবেই দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, একসময় তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হয়। তটিনীর স্বামীর কোন উন্নতির হয় না—প্রতিদিনই মৃত্যুর আশঙ্কা। তটিনীর ছেলে, মেয়েগুলোও বড় হয়ে যায়। তার ছেলে খোকন চাকরিও করে। দশ বছরে অনেক কিছু বদলেছে কিন্তু পরিবর্তন হয়নি শিশিরও তটিনীর জীবনের। তাই তারাও আগত দম্পতিকে নিজেদের আসল পরিচয় জানায় না। তাদের জীবন যে আহ্নিক গতির মতোই অপরিবর্তনীয়। শুধুমাত্র মাঝখানের দরজার আলোয় রচিত ছায়ার দরজাটাই চিরকাল এই দুটি প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয়ে থাকে।

'পা' গল্পটিও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে। গল্পের প্রথমেই জানা যায় বড় বৌ, ছোট বৌ রান্না সেরে রোজকার মত কাজকর্মের শেষে রেললাইনে আত্মঘাতী হতে যায়। প্রশ্ন জাগে কেন? মনে জাগে নানা সংশয়, নানা জিজ্ঞাসা এমনই এক জিজ্ঞাসা আমরা পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশ ফেল' গল্পেও। সেখানেও দেখি গল্পের শুরুতে চমক। নীরেন আই.এ পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করেছে। এমনই একটা খবর সংবাদপত্রের পাতায়। তা দিয়েই গল্পটি শুরু হয়েছে তারপরে কেন সেই আত্মহত্যা? তার কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। এরকমভাবেই 'পা' গল্পের চরম মুহূর্তকে প্রথমে বলে দিয়ে পাঠকের মনে নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কিন্তু পাঠককে বোকা বানিয়ে গল্পকার নিজ মুন্সিয়ানায় আত্মহত্যাকে গল্পের কেন্দ্রিয় বিষয় করে তোলেননি। পঙ্গু ছোট বউয়ের সংসারের জীবনে পুনরায় সফল হওয়ার ইতিহাসকেই মুখ্য বিষয় করে

তুলেছেন। উল্লেখ্য, আত্মহত্যা করতে এসে বড় বৌদির দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে কয়েক টুকরো হয়। আর ছোট বৌ আত্মঘাতী হতে এসেও সরে যায়। পালাতে গিয়ে তার এক পা কাটা পরেছে। এভাবে একটি মৃত্যু এবং অন্যটি মৃত অথচ জীবিত প্রাণীর কথার অবতারণা করে লেখক গল্পটি শুরু করেছেন।

ছোট বৌকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নানা চিকিৎসারপর দু'দিন পরে তার জ্ঞান ফিরলে, সে প্রথম কথাটা কি বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তার সংকোচ হয়, লজ্জা হয় বেঁচে ফিরে আসার জন্য—"আরও একবার অবধারিত মরতে যাবার সত্যের কাছে বেঁচে যাওয়ার সত্যটাই যেন মিথ্যে হয়ে যায়।"[১৬] এ অস্বাভাবিকতা, অসাধারণতা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে। অনেকবার সে চোখ খুলল, বন্ধ করল। দ্বিতীয়বার চোখ খুলেই ঠোঁট বুঝল সবকিছুই যেন খালি, শূন্যবোধ করল কিন্তু কিছুতেই কথা বলতে পারল না। তার স্বামী রাগ ও বিরক্তির কোনটিই প্রকাশ না করায় সে কি করবে ঠাহর করতে পারল না কিছুতেই। অবশেষে সে কথা বলে—"পা জ্বালা করছে খুব, কষ্ট হচ্ছে, চুলকাচ্ছে।"[১৭] সে বুঝল যে সে কোন কিছুই স্বাভাবিক করতে পারছে না। নিজের বেঁচে থাকার অস্তিত্ব, গতিকে, ধারাবাহিকতা যেন আত্মঘাতী হবার বাসনার দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তার একে একে রেলের আলো চোখে পরা, চোখ বন্ধ করা, চোখ বন্ধ করে আবার খোলা, খণ্ড খণ্ড শরীর পরে থাকতে দেখা। গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়া সব একে একে মনে করতে থাকে।

ছোট বৌ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ফিরে আসে এক অন্য সত্ত্বা নিয়ে। বাড়ির শিশুদের সাথে কথা বলে। আদর করে মেয়ে ইরাকে ডাকে, কথা বলে—ইরার মুখে উত্তর। চোখে প্রশ্ন। মেয়ে ইরা এবং মীরা কাজে ব্যস্ত। তাই তাদের সাহায্য করার জন্য সে সবজি কাটে। সকলের অবাক চাহুনি, চোখের নানা প্রশ্ন তাকে বিঁধতে থাকে; সে কিছুতেই পুরোনো ছোট বউ হতে পারে না। এমনকি সে শাড়িটাও আর আগের মত করে পরতে পারে না। সব কিছুতেই অসংগতি ধরা পড়ে তার। পুরোনো ছোট বউ কিছুতেই যেন ফিরে আসে না; সে স্বামীকে তেল লাগিয়ে দিতে পারে না। সারাদিন বসে বসে সবার হাঁটার কায়দাগুলোকে অবাক দৃষ্টিতে দেখে— "প্রতিটি মুহূর্ত এক একটা বিরাট বিরাট পাহাড় হয়ে ছোট বৌয়ের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। ছোট বৌ সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছে না। ছোট বৌয়ের আশঙ্কা

হচ্ছে আর পারবে না।"[১৮] তার চোখ পরে মৃত বড় বৌয়ের ছবির দিকে। বড় বৌকে তার সাহসী ও গর্বিত বলে মনে হয়—বড় বৌ এর সাজা এবং হাসি বিয়ের। ছোট বৌয়ের মনে হল বড়দির সাজা এবং হাসি মরার। বড় বৌয়ের ছবিতে তার নিজের প্রতিবিম্ব পরেছে। সে বুঝতে পারে যে বড় বৌ ও ছোট বৌ এক না; তারা ভিন্ন, আলাদা। সে যেন সর্বহারা এক পা কাটা এক বিচ্ছিন্ন সত্তার অধিকারী।

তার মনে হয়েছিল 'হাঁটা' যেন তার কাছে মানুষের মনোভাব মানসিকতার প্রতিফলন। জানালায় দাঁড়িয়ে তাই সে বিভিন্ন মানুষের চলাফেরা দেখে। তারা যেন তাদের হাঁটার মাধ্যমেই গন্তব্যকে জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার সে ক্ষমতা নেই—তাই তার রাগ, অভিমান আর হাঁটার মধ্যে প্রকাশ করতে পারবে—"ছোট বৌয়ের হাঁটা এখন সর্বদা একরকম ক্রাচের দোলন।"[১৯] সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বাচ্চারা লেখছিল। ইরা, মীরা, লবঙ্গ রান্না করছিল। হঠাৎ ট্রেনের বাঁশি শুনে ইরা আতঙ্কে মা ডেকে ওঠে। ছোট বৌ সব বুঝতে পারে—ছোট বৌ মরতে না পেরে এক পা খুঁইয়ে এসেছে। একথা কেউ ভুলতে পারবে না। সে রাতে সে চুপচাপ খেয়ে শুতে চায়। মনে মনে বট্‌ঠাকুর ও ছোটবাবুর সারা রাত না ঘুমানোর কারণ সে খুঁজতে চায়। অস্পষ্ট, স্পষ্ট অনিচ্ছার মধ্য দিয়ে সে ভাবে—

> "সে মরণ ও নয়, জীবনেরও নয়, কী কারণে ছোট বৌ মরতে গিয়েছিল
> তা সে ভুলে গেছে। কিন্তু মরতে গিয়ে যে একটা পা খুঁইয়ে ফিরে এসেছে...
> তা সে ভুলল না। কেউ ভোলেনি। এখন মরতে না পারলে সে আর
> বাঁচতে পারবে না।"[২০]

তাই সে কুয়োর সামনে ঝুকে ঝাপ দেওয়ার জন্য উদ্যত হয়। কিন্তু সে দেখে বারান্দায় বুলবুলকে দাঁড়িয়ে থাকতে। তাই দেখে সে লাইন থেকে উঠে পরার মত আবার উঠে পরে।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিস্থিতির প্রতিবাদ হিসাবে সে আত্মহত্যাকেই বেছে নেয়। পারিবারিক টানা পোড়নে তাকে বিধ্বস্ত বিপন্ন হতে হয়। সেই বিপন্নতার সাথে আবার উঠে দাঁড়ানো, বারবার হেরে যাওয়া। জীবন যুদ্ধে না পালিয়ে তাকে আবার জন্ম দিতে হয় আরেক সন্তানের। সুতরাং 'আত্মহত্যা' গল্পটির মূল কেন্দ্রিয় বিষয় নয়। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ছোট বউ কীভাবে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেল তাই গল্পের মূল বিষয়। তাই 'পা' গল্পের

শেষ লাইনে ‘‘এক বছর পর ছোট বৌয়ের এক দু-পাওয়ালা বাচ্চা হল।’’[২১] এই ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় গল্পটির পরিসমাপ্তি। অথচ ছোট বৌ দু’বার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল প্রকৃতির ধর্ম তাকে আবার ফিরিয়ে আনল জীবনের মূল স্রোতে। কেননা জীবনানন্দ দাশ জানিয়েছেন ‘গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে আরেকটি প্রভাতের ইশারায় অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।’ এইভাবে নাটকীয় অথচ স্বাভাবিক পরিণতিতে গল্পটিতে গল্পকার দেবেশ রায়ের মুন্সীয়ানা প্রকাশ পায়।

১৯৫৯ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ‘কোলকাতা ও গোপাল’ গল্পটি প্রকাশিত হয়। গোপালকে কেন্দ্র করেই গল্পটি আবর্তিত। গোপালই গল্পের মূল চরিত্র। তার চাকুরিহীন জীবনের বিপন্নতাই গল্পে বারবার এসেছে। পারিবারিক দায়বদ্ধতা, দায়িত্ব তার স্বাধীন জীবনের স্বপ্নময় জীবনের পথে যেন বাধার সৃষ্টি করেছে। জীবনের অসংলগ্নতাকে গোপাল কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। আবার ফিরেও আসতে পারে না স্বাভাবিক জীবনে।

দশ বছর আগে গোপাল স্বপরিবারে কোলকাতার কসবায় এসেছে। যৌথ পরিবারে সদস্য সংখ্যা প্রচুর—‘‘তিন কাকা-কাকিমা, তার মা। আর জ্যেঠিমাতো চলেই গেলেন। তার বাবা নেই। নিজের ভাই বোন তাকে নিয়ে সাতজন; কাকা, কাকিমাদের সবশুদ্ধ হবে জনাবিশেক।’’[২২] পরিবারের ও বিধবা মায়ের বড় পুত্র হওয়ায় নিজের ইচ্ছাগুলোকে একপ্রকার মেরে ফেলেই প্রাপ্ত চাকরির ক্ষেত্রে পা বাড়ায় সে। ফেল করার পর চাকরি পেয়ে মিথ্যে সুখে নিজেকে ভোলায়। —আর তার ফেলকে কেন্দ্র করে বর্তমানটার মধ্যে যে অপ্রত্যাশিত আবর্ত রচিত হয়েছিল, তাকে ঠাণ্ডা করতে পেরে গোপাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তবে বুঝতে পারে কিছুতেই চাকরিটাতে তার আনন্দ নেই। তবু নিজের পরিবারের আর্থিক সংস্থানের কারণে চাকরিটা ছাড়তেও পারে না—তাই নিজেকে ভুলে চাকরি করে গেছে আত্মত্যাগী গোপাল।

পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ করে চাকরি করলেও সে চাকরি স্থায়ী হয় না। চাকরির সাথে সাথে তার জীবনে নেমে আসে ট্রাজেডি। গোপাল দ্বিতীয় চাকরির সন্ধানে নাজেহাল হলেও কিছুতেই চাকরি জোটাতে পারে না। তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পরে—‘‘গোপাল নিজেকে ভুলে চাকরি করে গিয়েছে এখন চাকরি খুইয়ে আর নিজেকে খুঁজে পায় না।’’[২৩]

নিজের আত্মসন্তুষ্টির বিপরীতে নিজেকে হারিয়েও সে পরিবারকে আর্থিক নিরাপত্তা দান করেছিল। কিন্তু চাকরি হারিয়ে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। হতাশায় তার মনে আত্মহত্যার জন্ম দেয়। প্রাণচঞ্চল বেগময়, কর্মমুখর, কোলকাতার সাথে কর্মহীন গোপাল যেন কিছুতেই নিজেকে মেলাতে পারে না। —

> ''এই বাসগুলো হু হু করে লোক নিয়ে ছুটছে কোলকাতার হৃৎপিণ্ডে। রক্তচাই। সেই হৃৎপিণ্ড থেকে কোলকাতার সমস্ত দেহে রক্ত ছুটে বেরাচ্ছে, কোলকাতা বাঁচছে। ওই বাসগুলোতে যত লোক তারা সবাই কোলকাতাকে বাঁচাচ্ছে। ... কিন্তু সে তো চায় এই হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সঞ্চালন করতে, আর দেহ হয়ে রক্ত গ্রহণ করতে। না, তার যোগ্যতা নেই। সে একা নয়, সে ব্যক্তি নয়, সে পরিবারের। আর কোলকাতা কোলকাতা কোলকাতা সবাইকে একা চায়, কোলকাতা ব্যক্তি চায়।''[২৪]

কোলকাতা আর গোপাল যেন পরস্পর বিরোধী। কোলকাতা কর্মব্যস্ত আর গোপাল কর্মহীন।

কলেজে গোপাল ছিল প্রাণচঞ্চল। অথচ সে বাড়িতে, পারিবারিক বর্তমান সমস্যার সমাধানে যেন তার দৃষ্টি একমাত্র ভবিষ্যতেই আবদ্ধ। দুটি জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে ভারসাম্যহীন ও জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের শূন্য প্রাপ্তি থেকে তার আত্মহত্যার বাসনাই প্রবল হয়—''কোলকাতায় স্তব্ধতা নামছে। মধ্যরাত্রির মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। মৃত্যু মানে স্তব্ধতা।''[২৫] কোলকাতার বুকে বেকারত্বে গোপাল দিশেহারা, জ্ঞানহারা। তাই দোকানদারের কাছে কাঁচি, দড়ি চায় সে। অন্ধকার ঘরটিতেই এভাবেই আত্মঘাতি হতে চায় সে। জীবনের সাধারণ সমস্যার সমাধানে সে ব্যর্থ। তাই ঔষধের দোকানে নিজের অসচেতনে পৌঁছে সে ইঁদুর মারার ঔষধ চায়। আবার ফুটপাতে এক থেকে অপর ফুটপাতে যাওয়ার সময় গাড়ির হর্ণ শুনে চমকে যায় ও চলাফেরায় সাবধান হয়। তার মৃত্যুর কোনো কারণ নেই কিন্তু জীবনের প্রতি বিপন্নতা তাকে গ্রাস করেছে। তাই বিত্তশালী বন্ধু সমরের বাড়িতে মনে চাকরির আশা নিয়ে গেলেও শেষে বন্ধুর কাছে ল্যাবরেটরি থেকে ইঁদুর মারার ঔষধ চেয়েই ফিরে আসে।

এভাবেই তাকে নিরুপায়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা নিয়ে সে রাস্তায় নামে। শেষে আত্মিয়

দারোগার কাছে ইঁদুরের ঔষধের বন্দোবস্ত করে সে ওভারব্রিজের রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ায়। তার চোখে ঘুম, ভাবনায় যেন অমর হবে। এই ভেবেই আগত ট্রেনের সামনে ঝুকে পরে ও ট্রেনের চাকার ধাক্কায় মৃত্যু হয় তার। নিজের বিপন্ন অস্তিত্ব তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

'দুপুর' গল্পটি ১৯৫৮ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটির প্রারম্ভেই দেখা যায় জৈষ্ঠ্য মাসের ছুটির দিনে এক পরিবারের সদস্যদের একত্রে এক দুপুর কাটানোর কথা। পরিবারের কর্তা যতীনবাবু, তার স্ত্রী রেনুবালা ও দুই কন্যা মায়া ও সতী ও পুত্র মুকুল এই পাঁচজনের সংসার। এই ঘর যেন রৌদ্রের ঠিক বিপরীতের প্রতীক। দুপুরের বর্ণনায় লেখক এক তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা এনে বলেছেন—''দুপুর। টইটুম্বুর টস্‌টস করছে দুপুরটা। মধ্য সমুদ্রের মত নিস্তরঙ্গ, বিরাট ব্যাপক; চুম্বক পাহাড়ের মত আকর্ষণ; ফুলশয্যার পুরুষের মত স্থির সবল, জলন্ত।''[২৬] একে একে সতীর জানালা দিয়ে আকাশ, আম গাছের ছায়া, বটগাছের দিকে তাকিয়ে থাকা যেন এক নিঃস্তব্ধ অথচ প্রখর রোদের ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করেছে। সকলের মনেই দুপুর নানা ভাবনায় হাতছানি দিয়েছে।

সব কাজ শেষে যখন পরিবারের পাঁচটি প্রাণী ঘুমানোর জন্য শয্যা গ্রহণ করলেও কেউই ঘুমোতে পারে না। তারা নিজ নিজ কল্পনার স্তরে উন্নীত হতে থাকে। সতী দুপুরে বারান্দার চৌকিতে পরে আছে। দুপুরের রোদ যেন তার মাথা, মুখ, গা, গলা পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের প্রখর তাপে তার ঠোঁটের নীচে, কপালের দু'পাশে ও ঠোঁটের মাঝখানে যেন ঘাম ঝড়ে, তার ফর্সা দেহটি যেন সামান্য আচ্ছাদনে আবদ্ধ। চোখ বুঝে শুয়ে তার কচু পাতার ওপর পানের পিচ্ছল পিক পরে যাওয়া ও তা রৌদ্রে তাপকে শুষে যাওয়ার কথা। যেমন করে তার শরীর সমস্ত রৌদ্রের তাপকে শুষে নিচ্ছে যেন বিধাতার অতিব্যস্ত কোনো দিনের কোন এক ফাঁকে কোনরকম গড়ে তোলা সতী নামক এক আধাআধি মানুষ চর্তুদশীবাঙালী মেয়েটার ব্যথা বুদ্ধির অমিল ও শক্তি ইচ্ছার গরমিলে ভরা মনটা। সে শুনতে পায় সরু মোটা বেটে তারে এক হাড়হোড়ে আঙুল দিয়ে বাজানো এক মাটির বেহালার সুর। সে সুর শোনার জন্য সতী অস্থির হয়ে উঠতে থাকে।

অপরদিকে সতী বিছানায় শুয়ে নানাবিধ অলীক সতীনাবৃত্ত ভাবনায় ভাবিত হয়।

তীব্র তাপের প্রভাবে তার মনে হয়েছে মরার পরে চেতনা থাকলেও চিতায় জ্বলতে যে অনুভব হয় তারই অপেক্ষায় অপেক্ষমান—“আগুন হয়ে জ্বলতে জ্বলতে কখন তিনি অঙ্গার হবেন, তারপর নদী থেকে মাটির কলসীতে জল এনে ঢেলে তাকে নিশ্চিহ্ন করা হয়।”[২৭] তার সারাটা শরীর যেন ঘামে, আগুনে তামাটে হয়ে যায়। একে একে তার অফিসের পানের দোকানের নেশাতুর চোখ, পাশের ছোকরার গুন গুন আওয়াজ যেন মনে পরতে থাকে। সেও যেন বেহালার সুর শুনতে চায়। সুরটা যেন দেহের চর্বিটা গলিয়ে দেয়, বুকে আঘাত দেয়। সে যেন ভাবনায় যৌবনের উদ্দামতা, উজ্জ্বলতা ফিরে পেতে চায়।

রেনুবালার কাছে দুপুর ছোট্রখাট্র ভুঁড়িঅলা মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোকের মত দুপুরটা ঘুমোচ্ছে। শুয়ে শুয়ে প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হবার কথাই ভাবে। সেই কথাই যেন ভাবছে। সেই অনুভূতিকে সে যেন এতগুলো সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও ভুলতে পারছে না—“প্রথম অন্তঃসত্ত্বা বউ এর মত রেনুবালার তলপেট ভারী, গা থম থম। যেন তার সারা শরীর-এ রোগ এসেছে। মুখ ভারী, চোখ ভারী, বুক ভারী।”[২৮] এই ভাবনার সাথে সাথে সে যেন দুপুরকে গাছের কোটরে থাকা পিঁপড়েগুলো যেন শুয়ে শুয়ে কথা বলে, ঘোরে, ওঠে-নামে। সেও যেন বেহালার সুর শুনতে চাইছে, স্পষ্টভাবে।

দুপুরের ঝা চক্চকে রোদ যেন মুকুলের চোখে পরছে। সাদা শাড়ির নীচে রঙ্গীন সবুজ সারা পরলে যে রকম মিশ্রিত রঙিন রঙ হয় সে চোখ বুঝলেই সেই রঙ দেখছে—“সাঁতার কাটবার সময় ছিটকে ওঠা জলের রামধনুর মত জটিল, এই জটিল রং গুলোতে রঙিন দুপুর।”[২৯] মাটির বেহালার সুর ভেসে আসছে, সেই সুরের রং-এ যেন জানতে, বুঝতে চায় মুকুল।

মায়া তার কাঙ্খিত পুরুষের কথা ভাবছে। সেই পুরুষের অফিস থেকে ফেরার সময়ে জুতোর শব্দের আশায় আছে সে। তার কাছে সেই পুরুষের আগমনের মতই যেন দুপুরটা রহস্যময়ী ও অলীক—“পনেরো ষোল দিনের চেনা এক পরম প্রিয়জনের কাছ থেকে আসা প্রথম নীল চিঠির মত অতল রহস্য দুপুরটায়।”[৩০] পরিবারের সবাই দুপুরে নিজ নজ কল্পনায় বিভোর। তাদের নানান আশার কথা অসচেতনভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তা যেন দুপুরের বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মিলিয়ে যাবার মত—এ যেন বাস্তব অথচ

অলীক। সবাই মাটির বেহালার সুর শুনতে চেয়েছে। অথচ কেউই শুনতে পায় না। এ যেন তাদের অস্তিত্ব বিপন্নতার প্রতীক। অস্তিত্বের সংকটে নিষ্পেশিত জীবন ধারণ মাত্র। এভাবেই জীবন চলে বছরের পর বছর। মানুষ রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যেন নৈকট্য হারায়। রক্তের টান ফিকে হয়ে যায়—"পাঁচজন, আবার পাঁচজনের দিকে চাইল, চেয়েই থাকল, যেন পাঁচজন পাঁচজনকে কিছু একটা বলবে। ইযোদভিন্ন পাঁচটি ঠোঁটে তার আভাস।"[৩১] সুতরাং 'দুপুর' গল্পে কোন ঘটনা নেই, চরিত্রের বিকাশও নেই, দুপুরকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের পাঁচজন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাকে গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এরকম ছোটগল্প প্রায় দুর্লভ। আঙ্গিকের এই অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যে প্রশংসনীয়। গল্প এখানে আখ্যানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে অথচ ভাবানুভূতির একতাকে ধরে রেখেছে সম্পূর্ণভাবেই।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নতুন রীতির আন্দোলন শুরু হয়। বিমল কর ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা। পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত গল্পকার ছিলেন তাঁর পক্ষে। দেবেশ রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একাধিক নতুন বৈশিষ্ট্য তিনি বাংলা সাহিত্যে সংযোজন করলেন। ক. নতুন ঢঙে গল্প বলা, খ. দীর্ঘতম কোন কালসীমার বদলে স্বল্পতম কালসীমার মধ্যে জীবনের দেশ-কাল ভিত্তিক সমস্যাকে দেখানোর চেষ্টা, গ. সংক্ষিপ্ত এক বা একাধিক বিশেষ ঘটনার সাহায্যে সামাজিক জীবনের সাধারণ সমস্যাদি আবিষ্কারের প্রয়াস, ঘ. গল্প রচনার পরিপূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গল্প রচনা না করার দিকে সচেতনতা। দেবেশ রায়ের 'দুপুর' গল্পটি পঞ্চাশের দশকে নতুন গল্পরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষার একটি অন্যতম সফল দৃষ্টান্ত।

'জননী! জন্মভূমি!!' গল্পে মানুষ যেন ইতিহাসের সাথে যুক্ত চালিকা শক্তি। মানুষের প্রকৃতসত্য খোঁজার দ্বারাই নিজের আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায়। নিজের অন্তঃত্মাকে খোঁজার দ্বারাই সৃজনশীল হওয়া যায়। গল্পের শিল্পী কথক যেন নিজেকে খুঁজেছে। তার এই খোঁজাকে কেন্দ্র করে যেন শিল্পী নিজের মাতৃভূমিকে চিনতে চান। কিন্তু কোথায় তার মাতৃভূমি? পূর্ববাসা তার কাছে বিদেশ—"পূর্ববঙ্গ সরিয়তি শাসনের কল্যাণে আমার বিদেশ। পশ্চিম বাংলায় আমি একটি নম্বর, একজন উদ্বাস্তু—আমার দেশ কোথায়?"[৩২] লেখক উদ্বাস্তু হয়ে

পাকিস্তানে গিয়েও সার্টিফিকেট আদায় করতে পারেনি। এ বেদনা নিয়ে তার বেঁচে থাকা যেন অসম্ভব।

লেখকের আশা ছিল কোলকাতায় তিনি তার দেশকে ফিরে পাবেন। কিন্তু সেখানেও তিনি তা ফিরে পাননি। কলকাতাকে যেন মনে হয়েছিল—কোলকাতা শুধু ইঁট বা সিমেন্ট বা রিইন ফোর্সড কনক্রিট। তারপর শিল্পীর আশা ছিল গঙ্গার চিত্র-চিত্রণের মাঝে নিজেকে পাবে। কিন্তু তাও যেন ব্যর্থ হয়—নির্মম কোমল, অনতি উচ্চ ও অনতি প্রশস্ত বিশেষণ রচে রচে। তেমনই গঙ্গা নদী বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানেও তিনি ব্যর্থ হলেন। এরপর তিনি একে একে জন্মের ছবি আঁকবেন বলে ভেবেছিলেন—জন্মের অসংলগ্নতা হয় জন্মের প্রতীকে সংলগ্নতা পাবে, উপাধিহীনতা আর থাকবে না। সে ছবিও দ্বিধাগ্রস্ত হল। মৃত্যুর ছবি আঁকা হলে দেখা গেল—“কোদাল দিয়ে ওপরানো কবরের মাটি আমার তুলিতে লাল হয়ে গেল।”[৩৩] একে একে দাহন ও শবদাহের ছবিতেও তিনি শিকড়কে খুঁজে পেলেন না। এগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে চিনতে পেয়েছেন, আত্ম উপলব্ধির স্তরে পৌঁছতে চেয়েছেন। শিল্পী যন্ত্রণায় ভুগেছেন নিজেকে খুঁজে না পেয়ে। শেষে আত্মহত্যার আগে আর এক ছবি আঁকার কামনা প্রকাশ করেছেন, যে ছবিতে থাকবে পূর্ণাঙ্গ মানুষের খণ্ডিত চিত্র—“ত্রিকোণের সমাবেশে ছবিটিতে এই ব্যঞ্জনা আনতে হবে যে কখনো ছবিটিতে এই ব্যঞ্জনা আনতে হবে যে কখনো মনে হবে সমবেত একটি কর্মকাণ্ডের ছবি, কখনো মনে হবে খণ্ডিত দেহ মানবজাতির ছবি।”[৩৪] এই ছবির নাম দেন শিল্পী ‘পৃথিবী ১৯৬৫’। শিল্পীর আশা এ ছবি জাতিপুঞ্জে পাঠানো হয়। এই ছবি হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু বৎসরের প্রধান পোস্টার।

‘দখল’ গল্পে গল্পকার দেবেশ রায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চিত্র এঁকে তাদের বিপন্নতার ইতিহাসকেই মূর্ত করতে চেয়েছেন। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালের শারদীয়া ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায়। গল্পে উঠে এসেছে খাদ্য আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, নকশাল আন্দোলন, গণহত্যা—সবকিছুই বাসভূমির নানান অস্তিত্বকে নানাভাবে বিপন্ন করে দিল। আর এই তরঙ্গ বিক্ষোভের সুযোগে নানা সুবিধাভোগী শাসক সম্প্রদায় মানুষের মূল্যকে কানাবাড়ির পর্যায়ে নেমে এনেছিল।

গল্পের প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে জলপাইগুড়ি শহর ও তার উত্তরপূর্বে থাকা তিস্তা নদী,

বৈকুণ্ঠপুর ফরেষ্ট, সেবক পাহাড় ও শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থানের কথা। তিস্তার পূর্বে আছে পাহাড়পুর গ্রাম। এই গ্রামেই কাহিনির সূত্রপাত। গ্রামের বর্ণনায়—পাহাড়পুরে শুধু ধানক্ষেত আর কৃষক মানুষেরা। এখানকার জমিগুলো শহরের আলি সাহেবের ও খান বাহাদুরের। গ্রামবাসীরা আধিয়ারে জমি চাষ করে ও ঋণগ্রস্ত হয় জোতদারদের কাছে। তাদের কিছুই নেই—তাদের ঘরবাড়ি, গরু, লাঙ্গল সমস্তটাই জোতদারের। কিন্তু ভূমি আইন পাশ হবার পর তারা ভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে পরে। কৃষকরা ভূমির অভাবে বেকার হয়ে পরে।

এমতাবস্থায় তারা গ্রামের মাতব্বর বকরুদ্দিনের কাছে যায়। সে নিজে চাষ করে না, আধিয়ার দেয়। তার এক মেয়ে ও জামাই। জামাই ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজ পরে এসেছে। গ্রামের জামনা, হরিদাস, খোদাবক্স, জগু, অমনী সবাই একসাথে জানায় যে নদীর উর্বর চরটিতে তারা চাষ করার জন্য আবেদন নিয়ে এসেছে। গ্রামে খাবারের অভাব, চাষের অভাব দেখে বকরুদ্দিন জমি তদারকি করে দেখে ও সামান্য খরচ দিয়ে জমিটা চাষ করতে সম্মতি দেয়। এরপর এই পাঁচজন চাষী কঠোর পরিশ্রম করে জমি চাষ শুরু করে—পিনাদানার অভাবে শরীর ক্রমাগত জীর্ণ হয়ে আসে, সাপ সামান্য জিনিস, বাঘ ও শীতকালে হামেশাই আসে। এর ফলে তারা নানা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়। তার মধ্যে একটি প্রতিকুলতা হল ধূপগুড়ির তিলকচন্দ্র চাষীদের ধমক দেয় কিন্তু চাষীরা তাতে কর্ণপাত করে না। এর প্রায় পনেরো দিন পর মাতব্বর তিলকচন্দ্র আরও পাঁচজন লোক নিয়ে এসে মাচান বাঁধে ও সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয় নদীর তীরে। খবর পাওয়া গেল তিলকচন্দ্র 'ধূপগুড়ি কালটিভেটার্স কো অপারেটিভের' নামে চরটায় দখল চাইছে। তিস্তার পারের জলের অবিরল ধারায় বাতাসে ড্যামনাদের মাচান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তারা অবিচল থাকে তাদের লক্ষ্যে। তিলকচন্দ্রের বর্ণনায় লেখক বলেছেন—"তিলকচন্দ্র এ তল্লাটের বিখ্যাত দেউনিয়া, হাতে ছাতা, হাঁটুর ওপর খদ্দরের ধূতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি।"[৩৫]

দুর্গা পুজোর ভাসানের দিন নৌকায় করে ধূপগুড়ি থেকে সাত আটজন এসে খোদাবক্সকে আঘাত করে ও মারধর করে ফলে তাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে তিলকচন্দ্র দখল আদায়ের জন্য সমস্ত রকম কাজ করবে। তাই এই অবস্থাকে ঠেকানোর জন্য তারা

বকরুদ্দিন-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তার জামাতা বলে—“ত মুইকি করিম, চল না কেনে ডেঙ্গুয়া ঝাড়ত। সগাক ধর, উমরায় যদি ছুটির দিন করি দেয়, ত কর কেনে।”[৩৬] তারা এই বুদ্ধি করে যে পার্শ্ববর্তী ডেঙ্গুয়াঝারে বসে একসাথে মিলিত হয়ে এই কাজ সম্পূর্ণ করবে। এই কাজ একার দ্বারা সম্ভব নয়। সেই রূপে কার্তিক মাসে বুধবারে তারা ধান কাটার কাজ শুরু করল, সাথে থাকল ডেঙ্গুয়াঝাড়ের মানুষ ও সর্দার শুকরা। সঙ্গে নিল বাদ্য, তীর-ধনুক, কাড়া-নাকড়া। ভীরকেটু, উদিষ্টির, পবন সবাই দেখল ডেঙ্গুয়াঝারের কৃষকেরা ধান কাটছে। ধান যেন তাদের পাঁচজনের না থেকে সবার, সকল গ্রামবাসীর ফসলে পরিণত হয়েছে। এখানে ব্যক্তি সম্পদ সার্বজনীন সম্পদে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য ‘দখল’ গল্পে আখ্যানের একমুখিনতা আমাদেরকে গল্প রসাস্বাদনে সহায়তা দান করে।

‘মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট’ গল্পটিতে বার্ণেশ নামে এক পরিত্যক্ত জংশনের কথা আছে। মূলত এই জংশনকে পরিবর্তিত ঘাটকে কেন্দ্র করেই কাহিনি আবর্তিত। বার্ণেশ এর এক পাশে সদর জলপাইগুড়ি, অন্যপাশে মালবাজার থেকে কোচবিহার পর্যন্ত রেলপথ। এই দুই-এর সংযোগস্থল বার্ণেশ ঘাট বা জংশন। এখানেই জমা হয় ধূপগুড়ি, লাটাগুড়ি, চ্যাংরাবান্ধা, মেখলিগঞ্জ এমনকি আলিপুরদুয়ারগামী বাস। ক্রমে জংশনটি সরকার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়—“এখন মরচে ধরা রেললাইন, দু-একটা ভাঙ্গা গুদাম ঘর, পোড়োগুমটি মৃত জংশনের সাক্ষ্য।”[৩৭] এখন সেটাকে দেখলে ধ্বংসস্তুপ মনে হবে। এই জংশনের ঘাটটি আগে রেল কোম্পানীর ছিল, এখন সরকারী। এখান থেকেই কোচবিহার যাবার নানা রেললাইন এঁকে বেঁকে গেছে। বার্ণেশ আর জলপাইগুড়ির মাঝে একটা বিশাল চর আছে। শীতকালে সরকারি নৌকা বার্ণেশ ঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে চরে পৌঁছে দেয়। ওই পারে ট্যাক্সি থাকে। তবে বর্ষাকালে জলপাইগুড়ির পাশের চরটা নৌকায় পার হওয়া সম্ভব হয় না—ট্যাক্সিও থাকে না তখন, হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। বার্ণেশ থেকে এই ঘাটটি খুব জরুরী কারণ ম্যালেরিয়া, আমাশয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা যেকোনো কারণে গ্রামবাসীদের জলপাইগুড়িতে যেতেই হয়। অর্থাৎ জনসাধারণের অবস্থা শাঁখের করাতের মত—পার না হয়েও উপায় নেই, পার হওয়ারও উপায় নেই। তোর্ষার পূর্বের অধিবাসীরা আলিপুরদুয়ারে গিয়ে কাজ চালাতে পারে, তবে তোর্ষার পশ্চিমে ও তিস্তার মাঝখানের মানুষের একমাত্র

ভরসা জলপাইগুড়ি।

সরকার কর্তৃক বর্ষাকালে তিস্তার ঘাট-বিপজ্জনক বলে ঘোষিত হবার সাথে সাথেই রাজবংশী অধিবাসীরা ঘাট আর নদীকে কেন্দ্র করেই যেন বেঁচে থাকে। তারা নৌকা বয়ে অর্থ উপার্জন করে। এভাবেই চর পার হওয়ার কাজে এক রাজবংশী ছেলে ভাদু কাজ করে। বর্ষাকালে নৌকার পারে বাস এলে বাস থেকে যাত্রী জোগার করে ও অন্য সময় বাসের যাত্রী জোগার করে যে বকশিস আদায় করে। ভাদু অনেক ভাষাও জানে—রাজবংশী, ভাটিয়া, হিন্দি বলতে পারে সে। সরকারী বাসে সে ঘুরেও এসেছে। বাসের উপস্থিতির সাথে সাথে প্রবল গতিতে মানুষের জিনিষপত্র নৌকায় তুলে দেয়। যাত্রী একত্র করতে গিয়ে মহাজন মাঝি রাবণের সাথে তার বিরোধ বাঁধে। নৌকার সাথে তার সম্পর্ক না থাকলে যাত্রী সংগ্রহ করার কাজে সে ঘাটের মাঝিদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে যেন চলমান নদীর গতির সাথে সমতুল্য। প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধের সাথে লড়াই করে বাঁচার প্রেরণা যেন ভাদু নিজেই—কিন্তু সূচনাতে জংশন ও ঘাটের ঘোষিত মৃত্যুর বিরোধীতায় সেও একজন। এই জীবনের এই কাজ যেন সমান্তরাল ভাবে তার স্বপ্ন—এভাবেই দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম প্রতিযোগিতার দ্বারাই সে জীবনযুদ্ধে উত্তীর্ণ।

নৌকা ছাড়তেই রাবণ ও উভার সিং-এর নৌকার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উভার সিং ও রাবণ পিছে পিছে দাঁড় টেনে এগিয়ে যায়। বর্ষাকালে এই বিপদজ্জনক নদীকেও তারা তাদের অনুকূলে নিয়ে আসে স্রোতের বিপরীতে—"তিস্তার জল দুটো নৌকার দুপাশ দিয়ে হাঙরের মত নিষ্প্রলক নিষ্ঠুরতায় খলবল করতে করতে চলছে।"[৩৮] তাদের কর্মদক্ষতা, প্রাণচঞ্চলতা, বেগময়তাই নদীকে ভয়ংকর থেকে যেন বন্ধুসুলভ করে তোলে—যেন এ ভবিষ্যৎ সরকারি ফেরি বন্ধ—নদী বিপজ্জনক, —এই বিজ্ঞপ্তির মতই অর্থহীন। এভাবেই চরে লোক নিয়ে ওপারে পৌঁছে আবার ফিরে আসে—ফিরে আসার সময় তারা লগি টানে, কারণ এখন তারা যায় নদীর অনুকূলে। গল্পটিতে সামাজিকতা, আঞ্চলিকতার প্রভাব স্পষ্ট। খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও তাদের ভরসার ভিত্তি তিস্তা নদী। নদীর নির্জনতা, মাঝিদের জীবনের হতাশা যেন সমতুল্য। আবার তারা শুধুমাত্র বিপন্ন না, তারা একইসাথে সংগ্রামী মানুষও—যেন বন্ধু শত অশ্বশ্ব বিশিষ্ট বিদ্যুৎকে একটি স্বয়ং চালিত মাত্র দাসের মত খাটিয়ে

নিচ্ছে। রাবণ, উভার সিং, ভাদু এরা নানা দ্বন্দ্ব, প্রতিকুলতার মাঝেও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। গল্পকার অনবদ্য ভঙ্গিমায় এখানে তারই অবতারণা করেছেন।

'মানুষ রতন' গল্পের কাহিনি বেদনাদায়ক। গলেপ উনচল্লিশ জন যুবকের মৃত্যু। তাদের মৃত্যু নিয়ে নোংরা রাজনীতি। বরানগরে, বারাসাতে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তৎকালীন প্রশাসন কৃর্তক। সরকারিভাবে ঘটনার তদন্ত নেমে প্রাক্তন বিচারপতি রাষ্ট্রের চাপে বা ক্ষমতাসীন সরকারের চাপে গণহত্যার বিষয়কে অন্যমাত্রা দান করেছেন। এতে গণহত্যার দায় প্রশাসনের ঘাড় থেকে সরে যায়। তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের ভঙ্গিতে গল্পকার দেবশে রায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নৈতিক চেতনার হ্রাস ও মূল্যবোধের সংকটকে দেবেশ রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কেনই বা এতজন মানুষকে খুন করা হয়েছে তা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না, প্রধান বিষয় হয় তিনটি লাশের একটি অদ্ভুত জায়গায় পড়ে থাকার সূত্রে। দুটি থানা এলাকার সংযোগস্থলে ফাঁকা মাঠে জলা জায়গায় মৃতদেহগুলি পড়ে থাকায় কোনো তানাই মৃতদেহের দায় নিতে চায়নি। তৎকালীন তদন্তকারী বিচারপতি এ বিষয়কে সাংবিধানিক সংকট বলে চিহ্নিত করেছেন। দেবেশ রায় তীব্র ব্যঙ্গ তীব্র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের আধারে জানিয়েছেন—

> ''বর্তমানে আমাদের থানাগুলির ওপর কাজের চাপ অত্যধিক। জনসংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে। সেই অনুযায়ী থানার কর্মচারী বাড়েনি। এমতাবস্থায় যদি চৌহদ্দি নির্দিষ্ট নয় এমন সব জায়গায় মড়া পড়ে থাকে, তাহলে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। তাই আমার সুপারিশ রাখতে চাই যে সরকার নির্দেশ দিন—এরপর থেকে, যত আচম্বিতেই হোক, মরে পড়ে যাওয়ার বা মেরে ফেলে দেওয়ার সময়, হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই যেন খেয়াল রাখে যে একটি থানার ভিতর শরীরের সবটা যেন থাকে।''[৩৯]

এভাবে তীব্র কঠোর বিদ্রুপেই গল্পটির প্রকরণ শিল্প সৃষ্টির সহায়ক হয়ে সার্থকতা দান করেছেন। এমন আরো বিদ্রুপাত্মক ঘটনার পরিচয় পাই। গল্পকারের তথ্য অনুযায়ী এইরকম—

ক. ভ্যাসেকটমি অপারেশনের মতো মানুষের মাথায় অপারেশন করে তাকে দ্রুত

অসন্তুষ্ট করতে হবে। এতে করে মানুষ দ্রুত খুনি হয়ে উঠতে পারবে।

খ. খুন করার সময় খুনিকে খেয়াল রাখতে হবে, একটি মাত্র আঘাতে মানুষের হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী কিংবা অন্ত্রে মোক্ষম লক্ষ্যভেদ করার দিকে। কেননা বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছে যে মানবদেহের আন্তরযন্ত্রের হৃৎপিণ্ড থেকে উদর কোনো ব্যথা বোধ নেই।

'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম' গল্পে বিপন্ন অস্তিত্বের ক্রন্দনধ্বনি ফুটে উঠেছে এক গৃহবধূর সম্পর্ক নির্মাণের মধ্য দিয়ে। স্বামী তাপস, স্ত্রী লতা এবং শিশুপুত্র গুপু ওরফে গোপালকে নিয়েই চলছিল তাদের সংসার। একদিন সকালে বাজার করতে বেরিয়ে লতা শুনতে পায় তিনটি খুনের ঘটনার কথা। খুন হয়েছিল দুই পুরুষ এবং এক নারী। লতা এই সংবাদ থেকে পালাতে চায় কিন্তু পারে না—

> ''লতা অনেকক্ষণ ধরেই একটা গুর গুর শব্দ আর একটা হুই হুই এর আভাস পাচ্ছিল। সারাদিন ধরেই শব্দের ব্যাপারটা তার মাথার ভিতর এমন গেঁথে আছে যে, সে বসার ভঙ্গি বদলে পরীক্ষা করছিল শব্দটা তার মাথার ভিতরে, না বাইরে। ... শব্দটা ক্রমে প্রবল হলে লতাই একা যেন নুইয়ে যায়।''[৪০]

লতা কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারে না—

> ''... শূন্য ঘরে, তলানিওলা চায়ের কাপগুলোর ভিতর হাট করা দরজার ফাঁক দিয়ে লতা অন্ধের মতো তাকিয়ে—তার ছেলে সবগুলো কথা ফুটিয়ে ওই মিছিল থেকে কখন ফিরবে।''[৪১]

এপ্রসঙ্গে দেবেশ রায় তাঁর গল্প-সমগ্রের ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকায় যেকথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

> ''না। আমার কোনো গল্প-ভাবনা নেই। আপনি তো সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গায় মানুষ-নদী যেখানে খুব চওড়া হতে থাকে। শীতের এই সময় নদীর চরে বা পাড়ে মানুষ খেকো কুমির হয়ে থাকে মরা কাঠের মতো। নদী, চর, রোদ, জল, মাটি, ভেজা বালি এসবের সঙ্গে সেই কুমির এমন মিশে থাকে যে আনাড়ির পক্ষে তো অসম্ভব বটেই, খুব নাড়ির

জোরওয়ালা কারো পক্ষেও কুমিরটা যে আছে তা বোঝা মুশকিল। তেমন ভুল পায়ে তার লেজের সীমার মধ্যে দিয়ে পড়লে একটা ঝাপটে তাকে দাঁতে কামড়ে কুমিরটা জলের অতলে চলে যায় শরীরের পেশল গতিতে।"[৪২]

'তিস্তা পুরাণের' কাহিনি এক বৃত্তান্ত। গল্পটি বুড়িমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বুড়িমার বাড়ি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় আঙরা ভাসা আর গোলুন্দি এই দুই নদীর মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় আছে তারপরে নোমাই নদী, কুলজুয়া নদী পেরিয়ে দলগাঁও, সরুগাঁওয়ের জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা পশ্চিমে গেলেই বুড়িমার গ্রাম সেখানেই তার বাড়ি। বুড়িমা যে বাড়িতে থাকে তা কারো সবসময় আলাদা করে খেয়াল থাকে না। বুড়িমার দশ ছেলে-মেয়ের ছয় ছেলে আর চার মেয়ে। তার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে ফালাকাটা থেকে যে রাস্তা কোচবিহারের দিকে গেছে সেই রাস্তায় পুণ্ডিবাড়িতে। আপাতদৃষ্টিতে বুড়িকে নিয়েই গল্পটি লেখা হলেও শেষ পর্যন্ত তা থাকেনি। 'তিস্তাপুরাণ' গল্পের আখ্যানের এই বৃত্তান্ত বুড়ি এই বৃত্তান্ত যেন বুড়িমার আবার বুড়িমারও না। সকলের আবার সকলেরও না। তাই গল্পে দেখি বুড়িমার বংশ লতিকার ক্রমবিস্তারে নিজেই একটি পরিবারের পরিবার থেকে পাড়ার, পাড়া থেকে গ্রামের, গ্রাম থেকে অনেকগুলো গ্রামের, অনেকগুলো গ্রাম থেকে একটা জনপদের স্রষ্টা হয়ে পড়েছে—

"তেমনি, বুড়িমা দিনে রাতে কত অজস্রবার যেন মরে যায়, পড়ে থাকে, মরে কাঠ হয়ে যায়। তখন কেউ একজন, যে কেউ একজন, ছুঁয়ে দিলে বুড়িমা বেঁচে ওঠে।"[৪৩]

এমনিভাবে বহু বছর ধরে বুড়িমা বেঁচে থাকে নিজের মধ্যে।
গল্পের শেষে তারই ইঙ্গিত ধ্বনি প্রবাহিত হয়েছে—

"বা, বুড়িমার পৃথিবী এতই বড়ো, সেখানে এক নামের দু'তিনটি গ্রাম, দু'পাঁচটি জঙ্গল, পাঁচ-সাতটি নদী, ঝোরা, বা দু-চারটি পাহাড় বা চারিদিকের বেশ দিক, তো থাকতেই পারে।"[৪৪]

দেবেশ রায়ের গল্পে ভিন্ন আঙ্গিকে উত্তরবঙ্গ বারবার চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য

গল্পেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গল্পের নামকরণেই বুঝা যায় উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর কথা। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের আরো নানান নদী যেমন আঙরাভাসা, নোমাই, দুদুয়া প্রভৃতির প্রসঙ্গ পাই। জলপাইগুড়ির হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ি, চ্যাংরাবান্ধা প্রভৃতির স্থানরে নাম গল্প আখ্যানে যুক্ত করেছেন। দেবেশ রায়ের গল্পে আঙ্গিকের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দেবেশ রায়ের 'বানা' গল্পে দেখি তিস্তা নদীর বন্যার কথা। তিস্তার ধারেই ঘুটু, গজেনদের বাড়ি। তাদের কথায় তিস্তার ভয়াবহ বিধ্বংসী রূপের পরিচয় পাই।

> ''রাস্তাটা পুরনো হলদিবাড়ি রোডের নতুন পাক এবারের ভোটের সময় হুটপুট করে পনের দিনের মধ্যে বনানো। তখনই এখানকার লোকজন বলাবলি করছিল এই যে নতুন পাকটা দেয়া হইল আর দুই নদীর পাড়ত যে আরের রাস্তা আছে এই দুই রাস্তার ফাঁকে ত হেই দুইশঘর তিস্তার প্যাটত যাছে।''[৪৫]

ভোটের রাস্তাটা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই ফাঁক দিয়ে তিস্তার জল রাস্তার পূর্ব পাশে ঢোকে আরো খানিকটা এগিয়ে জলপাইগুড়ির ভোটের রাস্তার-পশ্চিম পাশটায় বন্যা হয়। বন্যা হলেই রাস্তার দুইপাশের লোকেরা রাস্তার উপর আশ্রয় নেয়। এই রাস্তাটাই মানুষ ও গরু-ছাগল গাদাগাদি করে রাত কাটায়। জল বাড়তে থাকলে তারা চৌপট্টির চালকলের দিকে ছুটতে থাকে।

জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তার অবিনবত্ব লক্ষণীয়—

> ''জলপাইগুড়ি সদর ব্লকটা দেখতে যেন ভিক্ষার্থী বুদ্ধের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গি নয় চলতে চলতে—ঐ পায়ের পাতাটা হচ্ছে অঞ্চল দক্ষিণ বেরুবাড়ি আর ডান পায়ের পাতাটা হচ্ছে অঞ্চল নন্দনপুর, বোয়ালমারি, মৌজা আরাজি-গড়ালবাড়ি, খারিজা বেরুবারির অংশ পশ্চিমে হেলানো। একেবারে মাথাটা বারোপাটিয়া—নুতনবাস অঞ্চল তারপর পাশ দিয়ে তিস্তা, ঠিক কনুইয়ের আর কোমরের ওখানে রংধামালী পাহাড়পুর—একেবারে যেন শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দক্ষিণ পুবে আসতে থাকা তিস্তা দক্ষিণ পশ্চিমের কোটি নিয়ে মৌজা মণ্ডলঘাটের

পাশ দিয়ে নন্দনপুর বোয়ালমারিতে ঢুকেছে। ঐ যে তুলে রাখা ডান পা সেটা একেবারে তিস্তার মধ্যে।”[৪৬]

দেবেশ রায় গল্পে আখ্যানে আরো জানিয়েছেন—বারো মাইল লম্বা বাঁধ তৈরি হওয়ার পাহাড়পুরে ও রাধামালীতে আর বন্যা হয় না। কিন্তু জলপাইগুড়ির মণ্ডলঘাটের কাছে এসে তিস্তা দু-পাশে ছড়িয়ে যায়। তাকে পূর্বমণ্ডলঘাট, নন্দনপুর, বোয়ালমারি, কচুয়া বোয়ালমারির চর নন্দনপুর আর বাঁশকান্টিয়া ভেসে যেত যে সময়। আর তাকে যে আশেপাশের অগণিত মানুষ ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে নিয়ে দুর্গতি ভোগ করতেন তার একটা স্পষ্ট ধারণা পাই এই গল্পে।

‘ভয়’ গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে ‘বারোমাস নববর্ষ’ নামক পত্রিকাটিতে। গল্পটির কেন্দ্রিয় চরিত্র নুপুর। তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনির বিন্যাস ১৯৯০ এর সাম্প্রদায়িক নানা জটিলতাকে কেন্দ্র করে মানুষের বিধ্বস্ত রূপ এই গল্পে চিত্রিত। দাঙ্গাকালীন মানুষের ক্ষয়িষ্ণু অস্তিত্ব তাদের আসল পরিচয় হলেও বাঁধার সৃষ্টি করেছে। তাই মানুষ প্রকৃত আত্মপরিচয় দানে হয়েছে ভীত, ইতস্তত, এই সংকটের কথাই গল্পে উল্লেখিত।

নুপুর শারীরিক গঠন ও মুখের দাঁড়ি তাকে জাতে হিন্দু হলেও যেন আজ পরিচয় বহন করেছে। লম্বা, সুগঠিত চেহারায় তাকে পাঞ্জাবি, শিখদের মত লাগে। তার ওপর পোষাকের বাদবিচার হীন আভরণ তার আসল আত্মপরিচয়কে যেন ছাপিয়ে যায়—

“আলিগড় পাজামা, বা এমনকি চোস্ত পাঞ্জাবি, জিন্স পাঞ্জাবি, জিন্স গেঞ্জি, শীতের সময় ফুলহাতা ক্যার্ডিশাল বা জিন্সেরই জ্যাকেট।”[৪৭]

তাই চেহারায় টিভি সিরিয়ালের পর্দার নায়কদের মত সাদৃশ্য না থাকলেও তার ঐতিহাসিক ও আভিজাত্যময় চেহারার জন্য নানা অভিধায় ভূষিত হয়েছে। অনেকে তাকে ফিদেল কাস্ত্রো, র‍্যাংলার আনন্দ মোহনবসু, গ্রেস, খেলোয়ার মোজেস—এইসব নানা নামে ডাকে। তার চেহারার সাথে মিল বিদেশী যুবকের—তাই সে কখনো রসিকতায় বলে বসত টেগোরের বাড়িটা কি করে দেখা যায়। আবার কখনো চারুলতার ভূপতির মতো বলত—“আঃ গ্লাডস্টোন গ্ল্যাডস্টোন।”[৪৮] কিন্তু তাই বলে সে অনেক জোর করা সত্ত্বেও কখনো থিয়েটার, ফিল্ম, নাচের অনুষ্ঠানে যায়নি।

এম.এ. পাস না করতেই তার ও গীতার বিয়ে হয়। নুপুর চিরকালই সাধারণ ও

উচ্চাকাঙ্খাহীন। তাই তাদের বিয়েটাও একপ্রকার স্বাভাবিক ভাবেই হয়—তাদের দাম্পত্যটা শুধু রেজিষ্টেশনের উপর নির্ভরশীল হল। রিসেপশনের উপর নয়। অর্থাৎ তাদের রেজিষ্ট্রি বিয়ে হয়। সামাজিকভাবে বিয়ে না হওয়ার ক্ষেত্রে তারা তাদের পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়। যদিও তাদের পরিবার ছিল আধুনিক মনস্ক। তবে সামাজিকতা মেনে নিয়ে তারা রিসেপশন নামক অনুষ্ঠানটি করতে চাইলেও তার সুযোগ হয়ে ওঠে না। কারণ তার আগেই চাকরীর কারণে তাকে দিল্লী যেতে হয়। ফলে—"তুই এর আধুনিকতা সম্পূর্ণ করতে প্রকাশ্য তুমি'র ঐতিহ্য পরিবর্তিত হওয়ার আগেই আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মাঝখানে একটা ফাক রেখেই।"[৪৯]

রাজধানী এক্সপ্রেসে নুপুরের টিকিট হয়। ২রা নভেম্বর তার যাওয়া ও ৪ঠা নভেম্বর তার ফেরার টিকিট হয়। কিন্তু ৩০শে অক্টোবর উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে তথা অযোধ্যা, লক্ষৌ, উজ্জয়িনী, আমেদাবাদ, ধানবাদ, কানপুর, মিরাট -এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে। ফলে ট্রেনটিতে ভীর অত্যন্ত কম থাকে। কারণ ট্রেনটিকে ঐসব জায়গা পেরিয়ে যেতে হয়।

স্টেশনে গীতা নুপুরকে ট্রেনে ওঠাতে আসলে স্টেশনে জনসংখ্যা কম হওয়ায় সে খুব ভীত হয়। অথচ নুপুরকে যাওয়ার জন্য বাধাও সে দিতে চায় না। কারর নুপুরের কনফারেন্সটাও জরুরী। গীতার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হলেও তা আরো জটিল ও প্রকট হয় ট্রলির উপর থাকা বিজ্ঞাপন, বই ও মলাটের চিত্র গীতাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে— "গীতা ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে শোয়ানো মলাটের পর মলাট আর ঝোলানো হরফের পর পর হরফ রক্তপাত, মৃত্যু, সংখ্যা, রক্তপাত, মৃত্যু।"[৫০]

দাঙ্গায় সেখানে শতাধিক মানুষ মারা গেছে। তাদের দেহে সারি সারি সাদা কাপড়—"শরীরের উপর সাদা চাদর, মানুষের পায়ের যে তলা কখনো দেখা যায় না, সেই তলা পুলিশের ইউনিফর্মের রঙ, পুলিশের টুপির রং, রাইফেলের ওপর পড়া আলোর রং, দাগ, করসেবা। পুলিশ মুখ্যমন্ত্রী, ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, রথযাত্রা।"[৫১] এইসব গীতার মনে তীব্র ছাপ ফেলে। আগে ও শুনেছে সে দাঙ্গার কথা। কিন্তু স্টেশনে তার ভয় প্রকট ও তীব্র হয়। তাই সে পাজামা, কুর্তা ছেড়ে নুপুরকে কোট প্যান পড়তে বলে। শেষে দাঁড়িটা কাটার কথা মনে হতেই দৌড়ে দাঁড়িকাটার জিনিসটা কিনে এসে

নুপুরকে ট্রেনে দাঁড়িটা কেটে ফেলতে বলে।

ট্রেনে উঠে নুপুর সব জানতে পারলে সে যেন নির্ভীক থাকে, সে যেন কিছুতেই তার চেহারার বিপরীত কিছু প্রমাণ করতে চায় না। তার পরিচয় সে ব্যক্ত ও উন্মুক্তই রাখে। আবার গীতার আশঙ্কার কথাকেও অগ্রাহ্য করতে পারে না—“ভয় করছে আমার, ভয় করছে।”[৫২] গীতার এ কথা তার কানে বাজে বারংবার। এমন অবস্থায় এক হিন্দিভাষী যুবক তার কাছে ধানবাদে টু টায়ারে-এ ওঠে যাবার প্রস্তাব জানালে নুপুর কারণ জানতে চাইলে সে জানায় অযোধ্যায় পুলিশের গুলিতে মানুষের প্রাণ গেলে মৃতদেহগুলোকে কলসে ভর্তি করে ধানবাদে ট্রেনে ওঠানো হয়। এই কলসের নাম অস্তিকলস, আর অন্য কলসগুলির নাম রক্ত কলস। সে কামড়ায় এগুলো ওঠানো হয় ঐ কামড়ায় বন্দুক দেখিয়ে মুসলমানদের নামিয়ে দেওয়া হয়। কারণ মুসলিমদের সংস্পর্শে কলসগুলো অপবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকে। যুবকটি জানায় তাই কোনো মুসলিম নিজের নামে আর টিকিট বুক করায় না। নুপুর বুঝতে পারে যুবকটিও নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে চলছে এই ট্রেনে। অপরদিকে নুপুরের চেহারার জন্য যুবকটি নুপুরের পরিচয়কে সংশয়াতীত ভাবে বুঝতে পারে। যুবকটি নুপুরকে মুসলিম মেনে নেওয়ায়, নুপুর বুঝতে পারে তার পাশে যথার্থ আত্মপরিচয় যাইহোক না কেন, তার বাইরের চেহারার আভরণ মুছে ফেলা কোন ভাবেই সম্ভব না। তার নিজের জীবনকে অনিশ্চিত মনে হয়—“যতকাল তাকে মারা না হচ্ছে ততক্ষণ বেঁচে থাকার জন্য একটা আস্ত শরীরের আশ্বাস তার শ্বাস-প্রশ্বাসের মত দরকারি হয়ে পরে।”[৫৩] তার মনে হয় গীতার কথা। ট্রেনটা যেন তাকে স্বাভাবিক জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে নিয়ে যাচ্ছে এক সংশয়াতীত জীবনের উদ্দেশ্যে প্রবল গতিতে।

‘উদ্বাস্তু’ গল্পটির প্রকরণ কৌশল অভিনবত্বের দাবি রাখে। গল্পটিতে অতীতের ঘটনা বর্তমান মানুষের অবস্থা সংলগ্নতা কিংবা অসংলগ্নতাকে দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার। গল্পটিতে সময়ের প্রেক্ষিতে সত্যব্রত ও অণিমার বিপন্ন অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। এর পিছনে যে চালিকা শক্তি কাজ করেছিল তা হল রাজনীতি, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, মানুষের কর্মকাণ্ডকে, জীবনকে এমনভাবে প্রভাব ফেলে যে মানুষ শুধুমাত্র ব্যক্তির হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন। সত্যব্রত ও অণিমা বল্লভপুরে এক কন্যা সন্তানের সাথে বাস করে। ঘটনাক্রমে

দেখা যায় দু'জন ব্যক্তি তাদের বাড়িতে এসে জানায় তাদের আত্মপরিচয় দেবার জন্য থানায় যেতে হবে। একথা শুনে হতভম্ব সত্যব্রত থানায় যায়। অণিমা খবর নিয়ে জানতে পারে তাকেও খেতে হবে আত্মপরিচয় দেবার জন্য। এই সামান্য বিষয়টিকে গল্পকার নিজস্ব শৈলিগুণে অনবদ্য ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—''যে পরিবারের মধ্যে যে স্বীকৃত, সেই পরিবার ছেরে; আজ বা কাল থানায় গিয়ে প্রমাণ দিতে হবে—তার আত্মার প্রমাণ, আজ অথবা কাল,''[৫৪] থানা থেকে যখন সত্যব্রত বাড়ি ফেরে তখন সে বিধ্বস্ত, বিপন্ন, অসহায়, নিঃস্ব, রিক্ত ব্যক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফলাফল তার জীবনকে ভয়ানক ভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। সত্যব্রত ও অণিমা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন তথ্যের অবতারণা করেছেন গল্পকার। এর মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন পরস্পর বিরোধী আত্মপরিচয় মানুষের জীবনকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এই অন্ধকার মানুষগুলোর জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।

গল্পকার 'জননী! জন্মভূমি!!' গল্পে এক শিল্পীর কল্পনা করেছেন। গল্পটি শৈলিগত দিক থেকে অভিনব। এখানে দেখা যায় শিল্পী কথক যেন নিজেকেই নিজেকে খুঁজছে। এই খোঁজাকে কেন্দ্র করেই শিল্পী নিজের মাতৃভূমিকে চিনতে চেয়েছেন। গল্পটির শব্দচয়নও অনবদ্য—''ত্রিকোণের সমাবেশে ছবিটিতে এই ব্যঞ্জনা আনতে হবে যে কখনও মনে হবে সমবেত একটি কর্মকাণ্ডের ছবি কখনও মনে হবে খণ্ডিত দেহ মানব জাতির ছবি।''[৫৫]

দেবেশ রায় তার গল্পের মধ্যদিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের জীবন ধারাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এটা তার একান্ত নিজস্ব রীতি না হলেও ভৌগোলিক বাধ্যবাধকতায় ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণির একটি শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'দখল'। এই গল্পে উঠে এসেছে খাদ্য আন্দোলন, জরুরী অবস্থা, নকশাল আন্দোলন, গণহত্যার কথা। গল্পের প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে জলপাইগুড়ি শহর ও তার উত্তরপূর্বে থাকা তিস্তা নদী, বৈকুণ্ঠপুর ফরেষ্ট, সেবক পাহাড় ও শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থানের কথা। গল্পটির শব্দশৈলি অনবদ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে—''কায় রে সগায় বাদ্যি বাজসে, ই কি পূজা পরব?''[৫৬] কিংবা—''ত মুই কি করিম, চল না কেনে ডেঙ্গুয়াঝাড়ত। সগাক ধর, উমরায় যদি ছুটির দিন করি দেয়, ত কর কেনে।''[৫৭]

বস্তুত দেবেশ রায়ের গল্পে ঘটনার গতিপ্রকৃতি পাঠককে এক নির্মল আনন্দের জগতে নিয়ে যায়। গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী কাহিনির অন্তিমে কোনো সুখকর বা করুণ পরিণতি তিনি দেখাতে চাননি। মানব সম্পর্কের আলো-আঁধারি প্রদেশের জটিল অন্বেষণই তাঁর প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের গঠনকৌশল নিপুণ, কোথাও বিদ্রুপ কোষমুক্ত তরবারির মত ঝংকার তোলেনি। অথচ গল্পের শিরায় শিরায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে চাপা বিদ্রুপের আর্তনাদ আর এভাবেই লেখক বাস্তব ও সমকালীন জীবনের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে তুলে আনেন ছোটো ছোটো মণি মুক্তা রূপ ঘটনা, যা শিল্প মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে আলাদা মাত্রা নিয়ে আসে পাঠক মনে। কথাকার দেবেশ রায়ের রচনাশৈলি প্রচলিত ধরণ থেকে যে পুরোপুরি আলাদা তা তাঁর গল্পগুলির সূচনা বাক্যেই বোঝা যায়। হয় গল্পগুলো কোনো প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে নয়তো যা দিয়ে উপসংহার টানার কথা তাই দিয়ে শুরু করেছেন। দেবেশ আখ্যান নির্মাণের সব ধরণের মৌলিকতা, সময় ও পরিসরের ক্রম, কথক স্বরের বিন্যাস, বিভিন্ন চরিত্রের চকিত আবির্ভাব ও কাহিনির সঙ্গে সংযুক্তি, বাচনিকতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাতায়তের যে কার্য-কারণ সূত্র সব ভেঙে দিয়েছেন।

দেবেশ রায়ের গল্পের আখ্যান রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যাদের গল্প বলা হচ্ছে তাদেরকে ব্যক্তিরূপের প্রত্যক্ষতায় ধরে দেওয়া। গল্প সমগ্রের ষষ্ঠ খণ্ডের 'বাঁচা না বাঁচার নিশানা' গল্পে দেবেশ রায় অরুন্ধতীর মুদ্রা অভ্যাস ভঙ্গির বিবরণ দেন—

> ''শনিবার রিহার্সাল শেষ হতেই, বাঁহাত দিয়ে হারমনিয়ামটা ঠেলে বা হাত দিয়ে হারমনিয়ামটা ঠেলে বা হাঁটুটা তুলে, ডান হাতের ভরে শরীরটাকে একটু এলিয়ে নেহাত বলার জন্যই বলেছিল কাল তো রবিবার। এখন তো সব শাহেব হয়েছ, উইক এণ্ডে কেউ কোন কাজ করে না। সারা উইক কে যে কী করে সেটাই বুঝি না।''[৫৮]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেও দেখি অরুন্ধতীর শররী ভঙ্গি আর শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিরূপের প্রত্যক্ষতায় চিনে নেওয়া। তার দৈনন্দিন জীবনের নানান টুকরো ছবি দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে। গানের স্কুল রিহার্সাল আবাল্য বন্ধু চয়নিকা মেয়ে দীপন জীবনসঙ্গী দয়া এসব নিয়ে সংসার জীবনে তার নানান প্রতিকূলতা অরুন্ধতীর কথায় কথকের ভাষ্যে নানাভাবে দৃষ্টিগোচর

হয়েছে। আখ্যানের বিন্যাস ৬০ পৃষ্ঠা জুড়ে হলেও এই লেখাটি একটি ছোটগল্পই। অরুন্ধতীর জীবন নির্মাণের আখ্যান। ১৯৭৫-এ অরুন্ধতীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তারপর আট বছরের দাম্পত্য আমেরিকায়। পরের তের বছর ধরে স্বদেশেই নিজের জীবন গড়ে তুলেছে সে। এই সময়ে দাম্পত্যের চূড়ান্ত অবসান এবং নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দাম্পত্যের সূত্রে এসে পড়ে দীপ্তির মৃতদেহকে সনাক্ত করার স্ত্রী দায়ের আইনি চেহারায়। অরুন্ধতীর জীবন ইতিহাস আখ্যান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অরুন্ধতীর শরীরী মুদ্রার বিবরণ দিয়েছেন—

> ‘‘অরুন্ধতী গলাটা সামনে সামান্যতম এগিয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট গলায় এগিয়ে যায়। সারা ঘরে গানটা চাপা গম গমিয়ে ওঠে। অরুন্ধতী গাইতে গাইতে খুব ধীরে খাড়টা একটু বাঁয়ে ঘুরিয়ে, চোখটা তার চাইতে বেশি ঘুরিয়ে দেখে নেয় সবার গলা ঠিকমত উঠছে কী না, সবার ঠোঁট ঠিকমত ফাঁক হচ্ছে কীনা, সবার ঝোঁক ঠিকমত একসঙ্গে পড়ছে কীনা।’’[৫৯]

এভাবে ‘বাঁচা না বাঁচার নিশানা’ গল্পে অরুন্ধতীর গানের রিহার্সালের এই বাণী চিত্র রচনা করতে গিয়ে দেবেশ রায় ভাষায় গড়া অরুন্ধতী চরিত্রকে স্পর্শ শ্রবণযোগ্য ও প্রত্যক্ষগোচর করে তুলতে পেরেছেন।

শব্দের পর শব্দ গেঁথে যে গল্প নির্মাণ সেখানে কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায় ভাস্কর্যের ভূমিকাই পালন করেছেন—‘অনৈতিহাসিক’ গল্পে ভাষা ওরফে ভাসিন্দিরের কাঠ সংগ্রহ করতে যে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে অনুসঙ্গ যে স্থাপত্য গল্পে নির্মিত হয় তার বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন—

> ‘‘ভাসা ঘুরে যায়। চারিদিকে তাকিয়ে তার মনে হয় দৃষ্টি যেন কখনোই হবে না। কিন্তু উত্তরে আর দক্ষিণে মেঘ নীচু হয়ে ঝরছে দেখা যায়। তিস্তা দিকে মুখ করে লম্বা দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে দিয়ে নিজের সম্পূর্ণ ন্যাংটো শরীরটা নিয়ে আয়েশে আড়মুরি ভেঙ্গে নেন, মাথার উপর তুলে ধরা হাত দুটোর আঙুলে আঙুলে জোড়া হাত দুটো টান টান, হাতের পেশিগুলো ফুলন্ত, পিঠের পেশিগুলো দুলে উঠে, হাতটা ওইরকম রেখে ভাসা একবার শরীরটাকে ডানদিকে মোছরায় আর তার পেশিগুলো

দড়ির মতো ডানপাকে পাকিয়ে যায়।"[৬০]

'কাল রাতের বেলায়' গল্পটি কাব্যধর্মী গল্প। গল্পটি একটিমাত্র চরিত্রের অন্তঃকথন। মুখ্য চরিত্র অনু। গল্পের আখ্যানে দেখি কয়দিন থেকে অনু একা-একা একটি ঘরে শুচ্ছে। মাঝরাত সে ঘুমোতে চাইলেও কিছুতেই ঘুমোতেই পারছেন না। বাইরের নানান শব্দ তার কানে আসে। তাতে অনুর মনে নানা ভাবনা আসে। হঠাৎ মা এই ঘরে তার শোয়ার ব্যবস্থা করল কেন? পাশের বাড়িতে এত জোরে শব্দ হচ্ছে কেন? টেবিল মেঝের উপর টানলে যেমন ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ হয়। তারপর আবার থুপ, থুপ ঘ্যাস, ঘ্যাস্ শব্দ। শব্দগুলি ক্রমাগত বেড়েই চলে। কিছুক্ষণ পরে আবার নিস্তব্ধতা। অনু শব্দগুলি আরো শোনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে নিজেই নীরবতার অঙ্গ হয়ে ওঠে। এমন সময় পাশের ঘরের একটি শব্দে অনু জাগল, চমকাল এবং সচেতন হয়। অনু ভাবে মা কি জেগে ওঠল, বাবা কী ঘুমের মধ্যে শব্দ করলেন? বাবা মা কি ঘুমিয়ে। মুকুলদিরা কি আজ এসেছেন? গল্পহীন এই গল্পে আছে অনুর অন্তঃকথন চেতনাপ্রবাহ রীতিতে। অন্ধকার ঘরে একা থেকে অনুর বিচিত্র মনোভাবই কাব্যধর্মী এই গল্পের বিষয়। লেখক দেবেশ রায় অনুর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে কুশলী ভাস্করের ভূমিকা পালন করেছেন—

> "অনু চঞ্চল হল বিছানার ঠাণ্ডা অংশের স্পর্শে সে চমকাল না অনু
> লেপটা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠল। মশারিটা তুলে, নামল। ঠাণ্ডা মেঝেতে
> পা দিল সেই ঠাণ্ডা কাল মেঝে অনুর পদতল দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।
> অনুর পা কাঁপল অনু দাঁড়াল।"[৬১]

এবং কাঁত হয়ে শুয়েছিল অনু। একদিকের কান বালিশের ওপর ছিল আরেকদিকে কান ছিল লেপ দিয়ে ঢাকা, এরকম বর্ণনায় অনুকে ব্যক্তি রূপের প্রত্যক্ষতায় চিনিয়ে দিয়েছেন লেখক দেবেশ রায়।

এভাবে দেবেশ রায়ের গল্পের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল অধ্যায়ের আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে একথা বলছি আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার গল্পের আঙ্গিক বিচার করি নাই। কেননা তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পৃথকভাবে গবেষণাপত্র রচনা করা যেত। আলোচ্য নিবন্ধে ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে যে আঙ্গিক বিচার যেখানে

'শব্দার্থৌ শরীরম', 'রীতি' বৈদগ্ধভঙ্গি, রসসৃষ্টি, অন্যতম প্রধান বিষয়। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। স্বাভাবিকভাবেই শব্দচয়নে, ভাষাগঠনে, বাক্যের যথার্থ ব্যবহারে উপমা সংযোগে, রসসৃষ্টিতে, দেবেশ রায়ের স্বতন্ত্রতা তুলে ধরেছি।

দেবেশ রায়ের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নিজেকেই ভেঙেচুরে তিনি বাংলা গল্পের ধারাবাহিকতায় একান্ত নিজস্ব পথেই এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। মনোজগতের নিবিড় কোনো এক অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে বাইরের বিশাল পটভূমিতে তার বিস্তার। আবার অন্যদিকে বাইরের বিপুল ঘটনা সমুদ্রের তরঙ্গ বুকে নিয়ে নদীর নিসঙ্গ বহমানতায় সে পথ এসে মিলতে চেয়েছে মনের গহনে, ঘর আর বাহিরের অন্তর্নিহিত সন্ধিবিন্দুতে। ভাঙা এবং গড়া দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে বাংলা গল্পচর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন বলেই গল্পকার হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তাঁর সাহিত্যে বক্তব্যটাই আসলে উপলব্ধির নামান্তর। ছোটগল্প রচনায় কথাশিল্পী দেবেশ রায় কেবলমাত্র বিশ্বব্যাপী মান্য ইউরোপীয় ঘরানাকে অবলম্বন করেননি। প্রায়ই তিনি এই ঘরানার একমুখী গতিসর্বস্বতা আর দু-একটি Episode -এ ব্যঞ্জনাগর্ভ রীতির পাশ কাটিয়ে দেশজ লোকজ ছাঁচে আখ্যান বিন্যস্ত করে ছোটগল্পের স্বতন্ত্র ধারা নিয়ে এসেছেন। এই ধারায় গল্প রচনায় ছিল সহজাত দক্ষতা। পাশাপাশি গল্পে গল্পে বহুধা গতি ও মানসিকতার জীবন ভাবনা ও জীবনদর্শনকে তাঁর ভাববস্তুর কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে তাঁর গল্পের নন্দন তত্ত্বের ভিত্তিটিকে মারাত্মক রকমে পোক্ত করে গড়েছেন। এই নান্দনিক উদ্দেশ্যই দেবেশ রায়ের সৃষ্টিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৩।

২. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২৫।

৩. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২৪।

৪. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২০।

৫. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৩৯।

৬. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৩৯।

৭. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৫২।

৮. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৫২।

৯. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২১।

১০. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২২।

১১. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২৮।

১২. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৪০।

১৩. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৪২।

১৪. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৫২।

১৫. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৫২।

১৬. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৪৬।

১৭. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৪৮।

১৮. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৫৭।

১৯. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৪৯।

২০. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৬৩।

২১. তদেব : গল্পসমগ্র-১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৬৪।

২২. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৬৬।

২৩. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৭৬।

২৪. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৭৬।

২৫. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৭৯।

২৬. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৮৯।

২৭. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৯১।

২৮. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৯২।

২৯. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৯৩।

৩০. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৯৪।

৩১. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৯৫।

৩২. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২২৩

৩৩. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২২৪।

৩৪. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২২৫।

৩৫. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৪৩।

৩৬. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৪৯।

৩৭. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৫৩।

৩৮. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৬২।

৩৯. তদেব : গল্পসমগ্র - ৩, দে'জ, ১৯৯৩, পৃ. ৮৮।

৪০. তদেব : গল্পসমগ্র - ৩, দে'জ, ১৯৯৩, পৃ. ২০১।

৪১. তদেব : গল্পসমগ্র - ৩, দে'জ, ১৯৯৩, পৃ. ২০২।

৪২. তদেব : গল্পসমগ্র - ৬, দে'জ, ১৯৯৬, ভূমিকা অংশ।

৪৩. তদেব : গল্পসমগ্র - ৬, দে'জ, ১৯৯৬, পৃ. ১২০।

৪৪. তদেব : গল্পসমগ্র - ৬, দে'জ, ১৯৯৬, পৃ. ১৩১।

৪৫. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৮০।

৪৬. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২৮১।

৪৭. তদেব : গল্পসমগ্র-৫, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ১৮৭।

৪৮. তদেব : গল্পসমগ্র - ৫, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ১৮৮।

৪৯. তদেব : গল্পসমগ্র - ৫, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ১৯০।

৫০. তদেব : গল্পসমগ্র - ৫, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ১৯২।

৫১. তদেব : গল্পসমগ্র - ৫, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ১৯৩।

৫২. তদেব : গল্পসমগ্র - ৫, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ২০১।

৫৩. তদেব : গল্পসমগ্র - ৫, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ২০৮।

৫৪. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ৩৯।

৫৫. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২২৬।

৫৬. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৫০।

৫৭. তদেব : গল্পসমগ্র - ২, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৪৯।

৫৮. তদেব : গল্পসমগ্র - ৬, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৭৪।

৫৯. তদেব : গল্পসমগ্র - ৬, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২১৪।

৬০. তদেব : গল্পসমগ্র - ৩, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ২১৪।

৬১. তদেব : গল্পসমগ্র - ১, দে'জ, ১৯৯২, পৃ. ১৯১।